ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana
SAREES
Cotton Printed Sarees
Contact - 22188744/1386

স্বস্তিকা

দাম ঃ ৪.০০ টাকা

আসবাব
বর্ধমান
(০৩৪২) ২৫৬৫৯৩১

৬১ বর্ষ ২৯ সংখ্যা ।। ৯ চৈত্র, ১৪১৫ সোমবার (যুগাব্দ - ৫১১০) ২৩ মার্চ, ২০০৯ ।। Website : www.eswastika.com

অনুপ্রবেশকারীকে দেখা মাত্র গুলির নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। কোনও বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীকে কাঁটাতারের বেড়া টপকাতে দেখলেই গুলি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বি এস এফকে। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের ৪৬ কোম্পানী বি এস

এফ জওয়ানরা এখন রীতিমতো প্রো-অ্যাকটিভ নীতি নিয়ে অনুপ্রবেশ ঠেকাতে নেমেছে বলে জানা গিয়েছে। মুম্বাই হামলার পর থেকেই সীমান্তে এই নীতি নেওয়া হয়েছে। যার সুফলও পাওয়া যাচ্ছে। গত

(এরপর ৪ পাতায়)

পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে বামবিরোধী হাওয়া

বুলেটের জবাব ব্যালটে দিতে তৈরি

গূঢ়পুরুষ ।। পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর আসন্ন লোকসভার নির্বাচনেও রাজ্যে ক্ষমতাসীন বামফ্রন্ট বড়সড় একটা ধাক্কা খেতে চলেছে। প্রকাশ্যে বিমান-বুদ্ধ-বিনয়রা যতই 'ডোন্ট কেয়ার' ভাব দেখান না কেন, তাঁরা রাজ্যের ৪২টি লোকসভা আসনের মধ্যে ২২-২৩টি আসনে জিতলেই বিরাট জয় হবে বলে মনে করছেন। এর কারণ শুধু এই নয় যে রাজ্যের দুই প্রধান বিরোধী দল তৃণমূল কংগ্রেস এবং কংগ্রেস জোটবদ্ধভাবে নির্বাচনে বামফ্রন্টের মোকাবিলা করবে। এবার রাজ্যজুড়ে বাম বা সি পি এম বিরোধী যে ক্ষোভ ও প্রতিবাদের হাওয়া উঠেছে অতীতে তেমনটি দেখা যায়নি। বি পি এল তালিকার পরিবারের জন্য বরাদ্দ রেশন কালোবাজারে বেচে দেওয়া, মুরগির মড়ক নিবারণে পাওয়া কেন্দ্রীয় অর্থ সাহায্য কমরেডদের ভাগ বাটোয়ারা করে খেয়ে নেওয়া, প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষণ প্রাপ্ত যুবকদের নিয়োগের নামে প্রতারণা, বিদ্যুৎ কেলেঙ্কারি ইত্যাদি নিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে জেলা ভিত্তিক প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিল হয়েছে। কিন্তু তেমনভাবে রাজ্য জুড়ে দানা বাঁধতে পারেনি। তাই ২০০১-এর বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস-তৃণমূল জোট অথবা ২০০৪-এর লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল-বিজেপি জোট পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র বামফ্রন্টকে ধাক্কা দিতে পারেনি।

এবার পরিস্থিতি সম্পূর্ণ অন্যরকম। সি পি এমের বিরোধিতা করছেন গ্রামগঞ্জের সাধারণ মানুষ। এই প্রতিবাদ বিরোধিতা কোনও বিশেষ রাজনৈতিক দলের পতাকা কাঁধে নিয়ে নয়। পশ্চিমবঙ্গের নিম্নবিত্ত অসংগঠিত আম জনতা এত বছর দালাল, প্রমোটার, কমরেডদের সীমাহীন লাল সন্ত্রাস

নন্দীগ্রামে পুলিশী নির্যাতন। (ফাইলচিত্র)

নীরবে সহ্য করেছে। সহ্যের বাঁধ ভাঙলো নন্দীগ্রাম সিঙ্গুরের মানুষের জীবন ও জীবিকার শেষ সম্বলটুকু কেড়ে নিতে লাল টুপি পরা সশস্ত্র ঠ্যাঙ্গাড়ে বাহিনীকে বুদ্ধ-বিমানবাবুরা মাঠে নামালেন। নন্দীগ্রামে পুলিশের পোশাকে হামলা চালানো এই পেশাদার খুনিরা গত বছর ১৪ মার্চ মাত্র কয়েক ঘন্টায় গুণে গুণে ১৪টি নরহত্যা করেছিল।

বিগত ২০০৭-২০০৮ এই দু'বছরে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামে লাগাতার খুন, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ চালিয়েও সিপিএম সেখানের নিম্নবিত্ত খেটে খাওয়া গ্রামের মানুষের প্রতিরোধ ভাঙতে পারেনি। কারণ একটাই, পশ্চিমবঙ্গের গ্রামের মানুষ পুরোপুরিভাবে কৃষি নির্ভর। তাঁদের জীবনধারণের একমাত্র সম্বল চাষের জমি লেঠেল পাঠিয়ে জবরদখল করার বুদ্ধ নীতির কাছে নতি স্বীকার করলে বেঁচে থাকার দ্বিতীয় অন্য কোনও পথ আর খোলা থাকবে না। এই বোধ থেকেই পশ্চিমবঙ্গের গ্রামের দরিদ্র কৃষিজীবী মানুষ আত্মরক্ষায় ঘুরে দাঁড়িয়েছেন। কোনও বিশেষ রাজনৈতিক দলের প্ররোচনায় নয়। এই সহজ সত্যটি বুঝেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই তিনি নন্দীগ্রাম-সিঙ্গুরের মাটিকে প্রতিরোধের প্রতীক করে রাজ্যের গ্রামে গ্রামে পাঠাতে দলীয় কর্মীদের নির্দেশ দিয়েছেন। অনেকেই এটাকে নির্বাচনী গিমিক বলে মনে করতে পারেন। হয়তো তাইই। কিন্তু অবশ্যই গ্রামের মানুষের কাছে বার্তা যাবে যে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের লাল আগুন তাঁদের ঘরেও লাগবে। তাই সতর্ক হও। প্রতিরোধ করো।

কমরেডরা বুলেট ব্যবহার করছে। তোমরা ব্যালটে জবাব দাও।

মমতাকে বাগে আনতেই জোট

সোনিয়ার বামবিরোধিতা ভোটের পরেও থাকবে তো?

বিশেষ সংবাদদাতা ।। এবার কি তবে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খেতে চলেছে? হয়তো আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ তাই দেখতে পাবেন। সোনিয়া গান্ধীরও তাই ইচ্ছা। তিনি আগামী দিনে দুই চির প্রতিদ্বন্দ্বী দল সিপিএম ও তৃণমূলকে সঙ্গে নিয়ে দিল্লীতে রাজত্ব চালাবার স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করেছেন। রাজনীতিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখনও যে অপরিণত রয়েছেন কংগ্রেস তৃণমূল জোট গঠন তার প্রমাণ করেছে। কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ও সিপিএম যৌথভাবে যে মমতা বধ অভিযান শুরু করেছেন তা তিনি এখনও বুঝতে পারেননি। এরাজ্যের কংগ্রেস নেতারাও যে মমতাকে বিশেষ পছন্দ করেন না তা সবাই জানেন। উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের কংগ্রেস কর্মীরা কি তৃণমূলকে ভোট দেবেন? সোনিয়া গান্ধীর মূল পরিকল্পনা হচ্ছে মমতাকে বিজেপি জোট থেকে সরিয়ে আনা, একাজে তিনি সফল। পরবর্তী কাজ মমতাকে নানা ভাবে সন্তুষ্ট করে চুপ করিয়ে রেখে সিপিএমের সাহায্য নিয়েই দিল্লীতে রাজত্ব করা। অন্যদিকে কমরেডদেরও কংগ্রেস ছাড়া গতি নেই। কেন্দ্রে কংগ্রেসের সঙ্গে বোঝাপড়া করে বামপন্থীরা যে সুযোগ সুবিধা পেয়েছে তা সহজে হাতছাড়া করতে রাজি নয়। আজ বাধ্য হয়ে তৃতীয় ফ্রন্ট গঠনের উদ্যোগ নিলেও কমরেডরা বুঝে গিয়েছেন যাদের নিয়ে তৃতীয় ফ্রন্ট গড়া হচ্ছে তাদের প্রভাব কতটুকু। তাই কমিউনিস্টরা এদের সঙ্গে দীর্ঘ মেয়াদি কোনও বোঝা পড়ায়ও যেতে রাজি হননি। এদের কেউ কেউ অতীতে বিজেপি-র সঙ্গে ছিল। কমিউনিস্টরা এটাও জানে বিজেপি কিন্তু মরা ঘোড়া নয়। সে কারণে বামেদের কংগ্রেস ছাড়া আর কোনও গতি নেই।

কিন্তু একটা দলের নেতা হিসেবে যে কৌশল থাকা দরকার মমতার তা নেই। যে কংগ্রেস দলকে তিনি সিপিএমের বি টিম বলেছিলেন সেই কংগ্রেস হঠাৎ সি পি এম বিরোধী হয়ে গেল কোন যাদু বলে তা তিনি জনগণকে এখনও পরিষ্কার করে বলেননি। তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরাও কি তা বিশ্বাস

মমতা ও সোনিয়া

করেন? সালিম-টাটাদের জমি দেওয়া নিয়ে তৃণমূল আন্দোলন করছে, গরীব চাষীদের উচ্ছেদ প্রসঙ্গে তৃণমূল যখন বিধানসভায় সোচ্চার হচ্ছে তখন বিধানসভায় কংগ্রেস সদস্য সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় জ্যোতি বসু আমাদের ভিত্তি, বুদ্ধদেব আমাদের ভবিষ্যৎ — কোন দৃষ্টিতে গ্রহণ করছে তৃণমূল? এই সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় আজ উত্তর কলকাতায় কংগ্রেস ত্যাগ করে তৃণমূলের প্রার্থী। যে প্রণব মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে দুদিন পূর্বেও মমতা সিপিএমকে সমর্থন করার অভিযোগ তুলেছিলেন তা আজ মানুষ ভুলে যাবে কোন যুক্তিতে। দীপা দাসমুন্সি, আবদুল মান্নান, শঙ্কর সিং কিভাবে তৃণমূলকে সমর্থন করবে? অতীতের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতা হলেও তৃণমূল প্রার্থীকে হারাতে চেষ্টা করেছে বিক্ষুব্ধ কংগ্রেসিরা। বিজেপিকে বাদ দিয়ে সিপিএমের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক লড়াই তাই ছলনা মাত্র। মমতার নেতৃত্বে কংগ্রেস সিপিএমের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বে এ বিশ্বাস এখন পাগলেও করে না। বরং মমতা সঙ্গে থাকলে এ রাজ্যের কিছু কংগ্রেস নেতার রোজগার বাড়বে। মমতাকে ব্ল্যাকমেল করে সিপিএমের থেকে কমিশন আদায় করতে সুবিধা হবে। পশ্চিমবঙ্গে হাজার বছর সিপিএম বলবৎ থাকলেও সোনিয়া গান্ধীর কিছু এসে যায় না। তাঁর একমাত্র লক্ষ্য নিজের রাজনৈতিক স্বার্থ অটুট রাখা। নির্বাচনে তৃণমূলের সঙ্গে আঁতাত করে লোকসভায় কিছু আসন পাওয়া এবং সি পি এমকে দুর্বল করা। ইউ পি এ সরকার বামফ্রন্টের ওপর একান্ত নির্ভরশীল বলে

(এরপর ৪ পাতায়)

বিজেপির আসন বাড়ছে ঝাড়খণ্ডে

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। ঝাড়খণ্ডে বিজেপি এবারের নির্বাচনে ১৯৯৯-র মতো ভালো ফল করতে পারে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। ১৯৯৯-র লোকসভা ভোটে (অবিভক্ত বিহার) ১৩টি আসনের মধ্যে এনডিএর দখলে ছিল ১২টি আসন। ২০০৪-এ অবস্থার পরিবর্তন হয়। ১৪টি আসনের মধ্যে ইউপিএ-র দখলে চলে যায় ১৩টি আসন। কিন্তু কংগ্রেস, ঝাড়খন্ড মুক্তি মোর্চা, আর জে ডি সহ সিপিআই জোটের পারফরমেন্সে খুশী নন সাধারণ মানুষ। শিবু সোরেন ও মধু কোড়া সহ তার ক্যাবিনেটের অনান্য মন্ত্রীদের আচরণেও সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হচ্ছে। এদের আমলে রাজ্যের শাসনতান্ত্রিক পরিকাঠামোরও অবনতি হয়েছে।

বিজেপি তথা এনডিএ এই সুযোগের ফায়দা তুলতে রীতিমতো প্রস্তুত। ঝাড়খন্ডের গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনী ক্ষেত্রগুলিতে নিজেদের স্বমহিমায় ফিরিয়ে আনতে বিজেপি ইতিমধ্যেই তাদের রণকৌশল তৈরি করে ফেলেছে। ঝাড়খন্ডের রাঁচি, হাজারিবাগ, ধানবাদসহ শহরের নির্বাচনীক্ষেত্রগুলিতে বিজেপি আগের থেকে বেশি শক্তি নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামছে। দল এই সমস্ত আসনগুলিতে হেভিওয়েট প্রার্থীদেরকেই দাঁড় করাচ্ছে বলে দলীয় সূত্রে জানা গেছে। জামসেদপুরের আসন থেকে এবারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা দলের বড় শক্তি অর্জুন মুন্ডা। রাঁচির জন্যও রাখা হয়েছে হেভিওয়েট প্রার্থীকে। চার চারবার সাংসদ রামতাহাল চৌধুরী এনডিএর পক্ষ থেকে রাঁচিতে নির্বাচনে লড়ছেন। হাজারিবাগে এনডিএ তথা বিজেপির অবস্থান এবারে আরও

ভালো। সেখানে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী যশবন্ত সিন্‌হা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। ইউপিএ এই আসনে প্রার্থী নির্বাচন ও জয়ী হবার বিষয়ে রীতিমতো কোণঠাসা। হাজারিবাগে এখনও পর্যন্ত সিপিআই-এর টিকিটে ভূমেশ্বর মেহতার লড়ার কথা ভাবা হলেও, সি পি আই-এর এক শ্রেণীর নেতা-কর্মীরাও এতে জেতার সম্ভাবনা কম বলেই মনে করছেন। যশবন্তকে হারাতে ইউপিএ-কে বেগ পেতে হবে বলেই তাদের ধারণা।

(এরপর ৪ পাতায়)

আয়ের সুবর্ণ সুযোগ!!!
SBI Life Insurance প্রমোট করছে ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় ব্যাঙ্ক State Bank of India, SBI Life সীমিত সংখ্যক Insurance Advisor নিয়োগ করছে।
যে কোনও পুরুষ / মহিলা HS পাশ / পিয়ারলেস, GTFS, Alchemist, Rose Valley ও সাহারা Agent / VRS নেওয়া Govt. Employee / Postal Agent / অবসরপ্রাপ্ত Bank Employee-রা আবেদন করতে পারেন।
যারা সফল কেরিয়ার করতে ইচ্ছুক তারা Interview-র জন্য যোগাযোগ করুন –
Mr. Ajoy Kumar Saha Mobile : 9830952221
SBI Life
INSURANCE
With Us, Your's Sure

উত্তরপ্রদেশে কোণঠাসা কংগ্রেস স্বীকার করলেন দিগ্বিজয় সিং

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত কংগ্রেস বর্তমানের জোট রাজনীতিতে উত্তরপ্রদেশ এবং বিহারের মতো গুরুত্বপূর্ণ কার্যকর জোট গড়ে তুলতে ব্যর্থ। উত্তরপ্রদেশে মুলায়ম সিং যাদবের কাছে রীতিমতো আত্মসমর্পণ এবং বিহারে লালুপ্রসাদের মদতে ছোট শরিকদলগুলির কাছ থেকে বেশি আসন আদায়ে দল ও দলনেত্রী যে একরকম অসফল তা বলাই যেতে পারে। অথচ দীর্ঘদিন ধরে গুরুত্ব ও সাংসদ সংখ্যার বিচারে উত্তরপ্রদেশ এবং বিহারের ভূমিকা নির্ণায়ক। "দলের পক্ষ থেকে পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী উপহার দিতে হলে ওই দুই রাজ্যে শক্তি বাড়ানো একান্তভাবেই আবশ্যিক — সম্প্রতি দূরদর্শনকে একথা বলেছেন দলের উত্তরপ্রদেশের ভারপ্রাপ্ত নেতা দিগ্বিজয় সিং। তিনি আরও বলেছেন, 'উত্তরপ্রদেশের জনসংখ্যা প্রায় ১৭/১৮ কোটি, সংসদীয় আসন ৮০টি, জেলার সংখ্যা ৭০টি। সেজন্য উত্তরপ্রদেশে চূড়ান্ত বিজয় বা সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন জিততে অনেক সময় লাগবে। দল সমাজবাদী পার্টির সঙ্গে একত্রে লড়াইয়ে আগ্রহী। তার থেকেও বড় কথা বিজেপি বি এস পি-কে উত্তরপ্রদেশে পরাজিত করা। এটা শুধু আসনের প্রশ্ন নয়। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বিজেপি-ই কংগ্রেসের কাছে একমাত্র ভয়ের কারণ। এখানে উল্লেখযোগ্য, শ্রীরামজন্মভূমি আন্দোলনের কারণে বিজেপি উত্তরপ্রদেশে দীর্ঘদিন ধরে দলীয় শক্তির বিচারে সবার আগে ছিল — শূন্য থেকে শুরু করেও। ২০০৪-এর সংসদীয় নির্বাচনে বিজেপি নানা কারণে পিছিয়ে পড়লেও রিক্ত স্থান দখল করেছে বি এস পি এবং এস পি। কংগ্রেসের কপালে ছিঁটে ফোঁটাই মিলেছিল। তবে দিগ্বিজয় সিং তাঁর

দিগ্বিজয় সিং

নিজের রাজ্য মধ্যপ্রদেশে ভালো ফলের ব্যাপারে আশাবাদী। যদিও তা একদিক থেকে আকাশকুসুম কল্পনা মাত্র। সদ্য সমাপ্ত লোকসভায় মধ্যপ্রদেশে বিজেপি-র সাংসদ ছিল ২৫ জন আর কংগ্রেসের চারজন। সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপিই রাজ্যে সরকার গঠন করেছে। দিগ্বিজয়ের কথায় এই সময় মধ্যপ্রদেশে দলের অবস্থা অন্ততঃপক্ষে বিহার-উত্তরপ্রদেশের তুলনায় ভালো। তাঁর এই বক্তব্যে উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেস — সপা আসন ভাগাভাগির আলোচনায় প্রভাব পড়তে পারে বলা হলে দিগ্বিজয়ের উত্তর ছিল — তিনি যা বলছেন তা দলেরই বক্তব্য, ব্যক্তিগত নয়। দিগ্বিজয় সিং দু'দফায় মধ্যপ্রদেশে মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। শ্রী সিং-এর বক্তব্য, অমর সিং-এর সর্বভারতীয় রাজনীতিতে সংবাদমাধ্যমের কাছে একটা স্বচ্ছ ভাবমূর্তি আছে। তিনি যা বলেছেন, আমি সে বিষয়ে কিছু মন্তব্য করব না।

বন্ধ হাবার মুখে স্বনির্ভর কর্মসংস্থান প্রকল্প

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। পশ্চিমবঙ্গের স্বনির্ভর কর্মসংস্থান প্রকল্পের ৫ কোটি টাকার ঋণে জর্জরিত রাজ্য সরকার। এই প্রকল্পের ৫ কোটি টাকার ঋণ এখনও ব্যাঙ্কগুলিকে পরিশোধ করতে পারেনি সরকার। ভোটের আগে এই ঘটনায় রাজ্য সরকার রীতিমতো বেকায়দায় পড়েছে। সম্প্রতি মহাকরণে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সরকারের বৈঠকে বিষয়টি উঠে আসে।

মূলত যুবক-যুবতীদের এই প্রকল্পের আওতায় রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি থেকে ঋণ দেওয়া হয়েছিল। যার গ্যারান্টার ছিল খোদ রাজ্য সরকার। ফলে এই ঋণের দায় গিয়ে বর্তাচ্ছে সরকারের ওপরে। অনেক যুবক-যুবতী ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নেবার পর তা আর পরিশোধ করেনি। সমস্যার শুরুর দিকে ব্যাঙ্ক এই সমস্যার কথা অর্থমন্ত্রী অসীম দাসগুপ্তকে জানালেও, সরকারের পক্ষ থেকে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ বৈঠকের পর আর ঋণ দেবে না বলে সরকারকে জানিয়ে দিয়েছে। ফলে সরকারের স্বনির্ভর যোজনা প্রকল্প এখন বিশবাঁও জলে। লোকসভা ভোটের আগে এই পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকার অনেকটাই কোণঠাসা।

এই সময়

আদর্শ দৃষ্টান্ত

লোকসভা নির্বাচনের মুখে নরেন্দ্র মোদির পাশাপাশি শিবরাজ সিং চৌহানের উন্নয়ণের মডেলকেও সামনে রাখছে বিজেপি। একদিকে মোদির সার্বিক উন্নয়ণ, অন্যদিকে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজের তৃণমূলস্তর পর্যন্ত উন্নতির নিদর্শনকে নির্বাচনের প্রচারে সামনে রাখতে চাইছে দল। নিজেদের রাজ্যের বিকাশে দুই মুখ্যমন্ত্রী সমগ্র দেশের নজর কেড়েছেন। এদিক থেকে কংগ্রেসের মুখ্যমন্ত্রীদেরও হার মানায় তাঁরা। বিজেপি এই উন্নয়ণকেই বেশি প্রাধান্য দিতে চাইছে। ফলে এখন শুধু মোদিই নয়, উন্নয়ণের নিরীখে শিবরাজও সমান গুরুত্ব পাচ্ছে।

নজর আন্দাজ

এনডিএ-র আমলে গৃহীত 'নদী সংযুক্তিকরণ' প্রকল্পের বিষয়ে বিগত ৫ বছর ধরে কোনও ভাবনা-চিন্তাই করেনি ইউপিএ সরকার। এই প্রকল্পের আওতায় দেশের প্রধান প্রধান নদীগুলিকে সংযুক্ত করার প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল বাজপেয়ী সরকার। প্রকল্প শেষ হবার দিন-ক্ষণ হিসাবে ২০১৬ সালকে লক্ষ্যমাত্রা হিসাবে ঠিক করা হয়েছিল। সম্ভাব্য আর্থিক ব্যয় ধরা হয় ৫ লক্ষ কোটি টাকা। এনডিএ এজন্য একটি কমিটিও গঠন করেছিল, প্রকল্পটিকে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে বাস্তবায়ণ করার জন্য। এখন মনমোহন সরকারের জন্য এই প্রকল্পের কাজ অনেকটা পিছিয়ে গেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই প্রকল্প রূপায়িত হলে, নদীগুলির সংযুক্তির পাশাপাশি নদীর ওপর নিয়ন্ত্রণও রাখা যাবে।

রাহুর দশা

সিপিএম-এর সময়টা ভালো যাচ্ছে না। ভোটের আগে নেতারা পাততে চাইছেন দই, হয়ে যাচ্ছে ছানা। শিলান্যাস থেকে সেলিমের 'জয় হো' সবেই কোনও না কোনও বাধা। রাহুর দশা। পার্টি কর্মীদের বিপদত্তারণের জন্য গ্রহণযোগ্যহীন পার্টি কর্মীদের আর প্রচারে নামাচ্ছে না দল। সম্প্রতি আলিমুদ্দিন চিঠির মারফতে দলীয় কর্মীদের এমনই নির্দেশ দিয়েছে। দলে ও দলের বাইরে যাদের অবস্থান ভালো নয়, তাদের যাতে প্রচার অভিযানে দল সঙ্গে না রাখে সেকথাও আলিমুদ্দিন কর্তারা তৃণমূলস্তরের নেতাদের বলে দিয়েছেন। তবে এতসবের পরেও অবস্থার তেমন কোনও পরিবর্তন হবে বলে অনেকেই মনে করছেন না।

বিপদজনক সংকেত

টিন-এজারদের মধ্যে মদের নেশা দিনকে দিন বাড়ছে। এক সমীক্ষার রিপোর্টে এমনই ধরা পড়েছে। সি এ ডি ডি নামে এক সংস্থা দু'মাস ধরে সমীক্ষা চালিয়ে দেখেছে যে এদেশের ৬৭ শতাংশ মদ্যপের বয়স ২১ বছরের নীচে। শহরের পাব বা বারগুলিতে ৮০ শতাংশ খরিদ্দারের গড় বয়স ২৫ বছরের কম। এই তালিকায় মহিলারাও বাদ নেই। তাদের মধ্যে অ্যালকোহল গ্রহণের প্রবণতা বাড়ছে। ১৯৯০ সাল থেকে টিন-এজারদের মধ্যে এই প্রবণতা বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে বলে সমীক্ষকদল তাদের প্রতিবেদনে জানিয়েছে। জাতির ভবিষ্যতের পক্ষেও এটা একটা বিপজ্জনক সংকেত।

ক্ষমতার ভরকেন্দ্র

দেশের স্বার্থে ক্ষমতার পালাবদলের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরলেন এনডিএ-র প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী লালকৃষ্ণ আদবানী। প্রধানমন্ত্রী হিসাবে মনমোহন সিং-এর একক সিদ্ধান্ত গ্রহণের কোনও ক্ষমতাই নেই। এই দায়িত্ব রয়েছে সোনিয়ার কাঁধে। ক্ষমতার ভরকেন্দ্র এখানে দ্বিধাবিভক্ত। এই ধরনের শাসন ব্যবস্থার দ্রুত পরিবর্তনের প্রয়োজন। আমাদের দেশের ইতিহাসে এ ধরনের প্রধানমন্ত্রী এই প্রথম ক্ষমতায় রয়েছে বলে শ্রীআদবানী জনসাধারণকে সচেতন করেন।

অবাক কান্ড

খোদ পুলিশেরই গোলা-বারুদের অভাব। তবুও জঙ্গিদের বিরুদ্ধে লড়ছে তারা। ঘটনাটা বাহবার নয়, অবাক করার। এমনই দুর্দশা দেখা গেছে অসম পুলিশের ক্ষেত্রে। ২০০৭-০৮ কম্পট্রোলার এ্যান্ড অডিটর জেনারেল বা ক্যাগের রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, গত বছর পাঁচ মাস পর্যন্ত অসম পুলিশ কোনও গোলা-বারুদ পায়নি। অথচ এরই মধ্যে একাধিকবার অসমে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ দপ্তর থেকে একে-৪৭ সরবরাহ করা হলেও, তার টাকাও স্থানীয় থানায় অনেক দেরিতে এসে পৌঁছেছে। শুধু তাই নয়, পুলিশ দপ্তর থেকে এ কে ৪৭ সহ এম এস এক্স প্রভৃতি অস্ত্র ও গোলা-বারুদের অর্ডারও দু'বছর দেরিতে দেওয়া হয়েছে বলে জানা যায়।

পঞ্চায়েতে দুর্নীতি

উন্নয়ণের নামে পুরস্কার জিতে নিলেও, ঝুলি থেকে বেড়াল বেরুতে শুরু করেছে উত্তরপ্রদেশে। ২০০৮ সালে ৭২৯টি গ্রাম পঞ্চায়েত নির্মল গ্রাম পুরস্কার জিতে নেয়। কিন্তু গ্রামীণ উন্নয়ণ মন্ত্রকের পানীয় জল সরবরাহ বিভাগের সচিব রাজ্য সরকারকে এবিষয়ে চিঠি পাঠালে পঞ্চায়েতগুলির দুর্নীতি প্রকাশ পায়। রাজ্য সরকার উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের নিয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করলে দেখা গেছে, ১৭টি গ্রাম পঞ্চায়েত সরকারকে ভুল তথ্য দিয়ে নির্মল গ্রাম পঞ্চায়েত পুরস্কার জিতেছে। বাস্তবে ওই সমস্ত পঞ্চায়েতে কোনও উন্নয়ণই হয়নি।

বেকারত্ব মোচন

জনকল্যাণমূলক কার্যসূচী বাদেও ২৮ হাজার বেকারের চাকরি উত্তরাঞ্চলে বিজেপিকে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে জেতাতে সক্ষম হবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী বি সি খান্ডুরি। সম্প্রতি দেরাদুনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে শ্রীখান্ডুরি বলেন, গত দু'বছরে উত্তরাঞ্চলে বিজেপি বেকার যুবকদের চাকরির জন্য যা করেছে তা দৃষ্টান্তমূলক। সাধারণ জনগণ এর ফলে বিজেপিকে আরও বেশি করে সমর্থন করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

এখন অথবা আর নয়

আর মাত্র কয়েক সপ্তাহ পরেই পঞ্চ দশ লোকসভা গঠনের জন্য নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু হইবে। এখনই আমরা নির্বাচক মন্ডলীরা যদি সচেতন না হই, তাহা হইলে চর্তুদশ লোকসভার এক কলঙ্কিত চিত্রের পুনরাবৃত্তি হইবার সম্ভাবনা থাকিয়া যাইবে। সকলেরই স্মরণে আছে, চতুর্দশ লোকসভার নির্বাচিত বেশ কিছু সাংসদের বিরুদ্ধে গুরুতর অপরাধের অভিযোগ ছিল। আর্থিক অপরাধ তো বটেই, এমনকী ধর্ষণ হইতে খুনের দায়ে পর্যন্ত কেহ কেহ অভিযুক্ত ছিলেন। পশু খাদ্য কেলেঙ্কারিতে আর্থিক তছরূপের দায়ে অভিযুক্ত হইয়া আর জে ডি নেতা তথা বর্তমান রেলমন্ত্রী লালুপ্রসাদ যাদব জেলের ভাত খাইয়া আসিয়াছেন। চতুর্দশ লোকসভা গঠনের পরে পরেই বিজেপি এইসব দাগি সাংসদদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হইয়া উঠে। একথা ঠিক, দেশের মানুষই এইসব দাগি অপরাধীদের সাংসদ হিসাবে নির্বাচিত করিয়াছেন। কিন্তু ইউপিএ সরকার এই দাগি সাংসদদেরই মন্ত্রিসভার জায়গা করিয়া দিয়া বিশেষ অধিকার বা সুবিধার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছে। এই প্রসঙ্গে প্রাক্তন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এম এস গিল-এর বক্তব্য হইল — কোনও সাংসদের বিরুদ্ধে যদি গুরুতর অভিযোগে আদালতে মামলা চলিতে থাকে তবে তাহার সাংসদ পদ বাতিল হওয়া উচিত। ঘটনা হইল, একদা যাহারা আইন ভঙ্গ করিয়া ছিলেন, এখন তাহারাই আইন তৈরির কর্তা। দেশের মানুষের ভাগ্য যাহাদের তৈরি আইন মোতাবেক নির্ধারিত হইবে। চতুর্দশ লোকসভায় কমপক্ষে এমন ১২৫ জন সাংসদ ছিলেন যাহাদের আইন প্রণেতারূপী দুর্বৃত্ত বলিতে অত্যুক্তি হইবে না। দেশের ১৭টি রাজ্য ও দুইটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চ ল হইতে তাহারা নির্বাচিত। বিভিন্ন ১৭টি রাজনৈতিক দলের তাহারা সাংসদ। ব্যাপারটি একটু বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে যে ৫৪৩ টির মধ্যে ৪৯৯ টি লোকসভা আসন সম্পর্কেই প্রশ্ন চিহ্ন রহিয়াছে। গত পাঁচ বছরে লোকসভার কোন ধরনের মানুষ ছিলেন, তাহা নির্ণয় করা আদৌ কোনও কঠিন কাজ নয়। গান্ধীর অনুসারী কংগ্রেসই হউক, কিংবা জাতীয়তাবাদী বিজেপি-ই হউক — দেশের সব রাজনৈতিক দলই দুনীর্তির রাজনীতিকরণ কিংবা রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ণের জন্য কমবেশি দায়ী। ভারতীয় গণতন্ত্রের পক্ষে ইহা হইতে লজ্জার আর কী থাকিতে পারে? যে ১২৫ জন সাংসদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি অভিযোগ রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে ৯৬ জনের দুই বা ততোধিক বছরের জেল হইতে পারে, কমপক্ষে ২৭ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এমনকী মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত হইতে পারে। ২০০৪ সালে লোকসভায় যখন নির্বাচিত হইলেন তখন এমনই সব গুরুতর অপরাধে তাহারা অভিযুক্ত ছিলেন। আমাদের গণতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার প্রতিষ্ঠাতাদের প্রতি ইহাকে উপহাস ছাড়া আর কী বলা যায়।

এইসব নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরাই আইনপ্রণেতা এবং সাংসদ ও মন্ত্রী। জাতির ভাগ্য নিয়ন্তা। দেশের মানুষকে যাহারা আইন মানিয়া চলিতে বাধ্য করেন নিজেরাই তাহা পালন করেন না। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল,ফৌজদারি আইনে অভিযুক্ত এই ১২৫ জন সাংসদের মধ্যে বেশ কয়েকজন কিন্তু নবনির্বাচিত নহেন। ইতিপূর্বে তাহারা সাংসদ ছিলেন, এমনকী কেহ কেহ দুই বা ততোধিক বার সংসদে নির্বাচিত হইয়াছেন। এই বিষয়টি এই দেশের রাজনৈতিক দলগুলির চরিত্রও নগ্নভাবে প্রকাশ করিয়া দিয়াছে। এইসব দাগি অপরাধীদের নির্বাচনে প্রার্থী হিসাবে দাঁড় করাইবার একটি স্বাভাবিক প্রবণতা এই রাজনৈতিক দলগুলির রহিয়াছে। কেননা এইসব প্রার্থীরা অর্থবল ও পেশীবল — দুই শক্তিতেই বলীয়ান যাহা নির্বাচনী যুদ্ধে র প্রধান অস্ত্র। আর সেই কারণেই শুধু পেশী শক্তির প্রয়োগ ও মানুষকে সন্ত্রস্ত করিয়া নির্বাচনী যুদ্ধে নিজেদের এবং সেই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দলের জয়লাভ তাহারা সুনিশ্চি ত করে।

প্রশ্ন হইতেছে, পরবর্তী লোকসভা এইসব দাগি অপরাধী হইতে মুক্ত হইবে ইহার কি নিশ্চ য়তা আছে? বেদনার বিষয় হইলেও স্বীকার করিতে হইবে, যে ধরনের রাজনীতি এখন চলিতেছে এবং অপরাধীরা যেভাবে রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করিতেছে, তাহাতে পঞ্চ দশ লোকসভা দাগি সাংসদ হইতে মুক্ত হইবে, এমন আশা করা যায় না। তবুও এই হতাশার বাতাবরণ হইতে বাহির হইবার পথ অনুসন্ধান করিতেই হইবে। আমাদের দেশের ভোটদাতারা যদি নিজেদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয় এবং এইসব দুরভিসন্ধিপূর্ণ ও বিবেকবর্জিত প্রার্থীদের চিরতরে বিদায় করিবার জন্য নিজেদের শক্তিকে ব্যালটের মাধ্যমে প্রয়োগ করে — একমাত্র তখনই আমরা আমাদের গণতন্ত্রকে কলুষ মুক্ত করিতে সমর্থ হইব। আর এভাবেই নির্বাচকেরা গণতন্ত্রের মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত এবং পরবর্তী প্রজন্মকেও এই কলুষিত বাতাবরণ হইতে মুক্ত করিতে পারে। রাজনৈতিক দলগুলি যদি গণতন্ত্র বিকাশের পক্ষে সুস্থ ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে নির্বাচকদেরই আগাইয়া আসিতে হইবে। দাগিদের বুলেটের আতঙ্ককে ব্যালটের মাধ্যমেই নির্বাচকরা প্রতিহত করিতে পারেন এবং ইহা সম্ভবও। যদি আমরা নিজেদেরকে বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের পূজারী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে ইচ্ছা করি তবে এদেশের গণতন্ত্রের অন্যতম স্তম্ভ সংসদকে দাগি অপরাধীদের আখড়া কিছুতেই হইতে দেওয়া যাইবে না। মনে রাখিতে হইবে — এখনই সেই পরিবর্তনের সময় উপস্থিত হইয়াছে — এই সুযোগ আর নাও আসিতে পারে।

নন্দীগ্রামের পর নয়াচর
পরিবেশবিদরা কি বলেন ?

ডঃ নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত

প্রথমে সিঙ্গুর এবং তারপর নন্দীগ্রাম পশ্চি মবঙ্গে একটা নতুন জন জাগরণ এনে দিয়েছিল। এবার কি তবে নয়াচর তাকে নিয়ে যাবে কাঙ্ক্ষিত পরিণতির দিকে?

রাজ্যে এত অনুর্বর বন্ধ্যা ও পাথুরে জমি পড়ে থাকলেও রাজ্য সরকার টাটার স্বার্থে জোর করে সিঙ্গুরের আট ফসলি জমি কেড়ে নিয়েছে। সেই ভয়ঙ্কর প্রক্রিয়ায় বলি দেওয়া হয়েছে কিছু প্রাণ ও নারী দেহকে।

তবে শেষ পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রীকে সিঙ্গুর থেকে পালিয়ে আসতে হয়েছে। টাটাদের 'ন্যানো' কারখানা সরাতে হয়েছে ভিন রাজ্যে। আর নন্দীগ্রামে পুলিশ ক্যাডারদের যৌথ বাহিনীর গুলিতে অন্তত ১৪ জন কৃষক প্রাণ দিয়েছেন, আহত হয়েছেন প্রায় দুশো জন, সতীত্ব বিসর্জন দিতে হয়েছে অনেকঅসহায় নারীকে। নেতা ও পুলিশকর্তাদের ঘৃণ্য নারকীয়তাকে কিন্তু উপেক্ষা করে নন্দীগ্রামের অপরাজেয় মানুষ এক ঐতিহাসিক প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন, পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন কিছু বিরোধী দল ও বিবেক সমৃদ্ধ বুদ্ধি জীবীরা।

তার ফলে সেই সংগ্রামেও বিজয়ী হয়েছেন প্রতিবাদী মানুষ। দাম্ভিক মুখ্যমন্ত্রীকে ভগ্নকণ্ঠে বলতে হয়েছে—এখানে বিদেশী মুনাফাকারী সালেমের হাব্ হবে না।

এটাই ছিল স্বাভাবিক। হোনেকার চেসেস্কুদের জীবন থেকে শিক্ষা না নিলে ইতিহাস কাউকে ছাড়বে না। বলদর্পী শাসকদের স্থান হবে মহাকালের আস্তাকুঁড়ে।

কৃষিতে যেক্ষেত্রে আমরা দারুণভাবে পিছিয়ে আছি, ধান-ডাল-সবজীকে সম্বল করেই আঠাশটা রাজ্যের মধ্যে মাঝামাঝি জায়গায় স্থান করতে পেরেছি---সেক্ষেত্রে দরকার ছিল একটা প্রকৃত কৃষি বিপ্লব। তাকে ভিত্তি করেই অনুসারী, মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্প নিয়ে যাত্রা শুরু করা উচিত ছিল। কাজে লাগানো উচিত ছিল বন্ধ্যা, অনুর্বর, একফসলি ও পাথুরে জমি। ব্যবহার করা উচিত ছিল বন্ধ চা বাগান। খোলা দরকার ছিল মৃত কলকারখানা। আর জমি নেওয়ার ব্যাপারে উচিত ছিল কেনাবেচার বাজারী নিয়ম ও দ্বি-পাক্ষিক সমঝোতার ওপর গুরুত্ব আরোপ।

কিন্তু অজ্ঞতা, দম্ভ, লোভ ও দলীয় স্বার্থে এই রাজ্যের শাসককুল পুলিশের গুলি ও ক্যাডারদের নারী-মাংসের প্রতি লোলুপতাকে ভিত্তি করে শিল্পপতিদের পদলেহন করতে চেয়েছে। মার্কসবাদ নাকি শোষণের অবলুপ্তি ঘটায়--আমাদের মার্কসবাদী মার্কস-এর তত্ত্ব পড়ে প্রলেটারিয়েটদের ধবংস করার কাজে মেতে উঠেছে।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পরাজয়ের পর দুর্যোধন দ্বৈপায়ন হ্রদে আশ্রয় নিয়েছেন আবার যুদ্ধে র জন্য। বুদ্ধ বাবুও সিঙ্গুর নন্দীগ্রামের বিপর্যয়ের পর নয়াচরে দুর্গ গড়ছেন-- সেখানে কেমিক্যাল হাব হবে, তাঁর অক্ষয় কীর্তি স্থাপিত হবে সুবে-বাংলায়। সঙ্গে আছে কেন্দ্রের বন্ধু-সরকার।

এই প্রচেষ্টাটি কেমন?

সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের ব্যাপারে আমরা রাজনীতির একটা কথাও বলিনি---শুধু অর্থনীতির যুক্তি দিয়েছি। তেমনি নয়াচরের ব্যাপারে আমরা বিজ্ঞানী, পরিবেশবিদ প্রমুখের স্মরণ নেব, কারণ বিষয়টা তাঁদের বিদ্যা সংক্রান্ত। এই ধরনের ব্যাপারে রাজনৈতিক নেতাদের বাগাড়ম্বরে নয়, গুরুত্ব দেওয়া উচিত বিশেষজ্ঞদের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ওপর। অভী দত্ত মজুমদার, পার্থসারথি চক্রবর্তী প্রমুখ বিজ্ঞানী, কল্যাণ রুদ্রের মতো পরিবেশবিদ, সুব্রত শিকদার (জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার প্রাক্তন ডেপুটি ডিরেকটর)-দের মতো গুণীজন নয়াচরের ব্যাপারে কি জানিয়েছেন, সেটা লক্ষ্য করা যাক ---

* এই চরটা সাগরের গড় জলস্তর থেকে মাত্র ১.৫ মিলিমিটার উঁচুতে অবস্থিত। জোয়ারের সময় এর বিস্তীর্ণ এলাকা প্রায় সাড়ে ৩ মিটার জলে ডুবে যায়। সুতরাং এই চরের ভূমি গঠন প্রক্রিয়া এখনও শেষ হয়নি। তাহলে এখনই এখানে শিল্প স্থাপন সম্ভব? এটা যদি ডুবে যায়?

বলা দরকার, এই চরকে অনেকটা উঁচু করতে হবে এবং যুক্ত করতে হবে মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে। হলদিয়া নয়াচর ব্রীজ করলে জাহাজ চলাচলের পথে আরও বেশি পলি জমতে পারে।

* এখানে বড় কারখানা করা হলে তাপ ও চাপে মাটি সঙ্কুচিত হয়ে ধসে যেতে পারে।

* কেমিক্যাল হাব্ হলে যে পরিমাণ বর্জ্য (কারসিনোজেনিক, মিউটেজোনিক ও অন্যান্য বিষাক্ত পদার্থ) বেরিয়ে আসবে সেগুলোকে জমিয়ে রাখা যাবে না। ফেলতে হবে সাগর জলে। তার ফলে উপকূল এলাকার প্রাণীজগৎ ধবংস হয়ে যাবে, বিষাক্ত জীবাণু কণা জলে ভাসবে। খরস্রোত প্রবাহ সেগুলোকে সুন্দরবন পর্যন্ত পৌঁছে দেবে, তখন জোয়ারে সেই জল বিপন্ন করবে বিস্তীর্ণ অঞ্চ লকে।

* ভূমিক্ষয়ের বিপদও থেকে যাচ্ছে। এই ব্যাপারে উপকূল নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ বা 'কোস্টাল রেগুলেটরি অথরিটি'র ছাড়পত্রের দরকার। সেটা নেওয়া হয়েছে কিনা, এখনও তা আমরা জানি না।

* জীবিকাচ্যুত হবেন কয়েক হাজার ধীবর পরিবার। তাঁদের কথা ভাববে কে? হাবের জন্য বলি দিতে হবে তাঁদের?

* সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ অরণ্য এখনই বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে। এই হাব্ হলে সেটা একেবারেই শেষ হয়ে যাবে। বিপদ ছড়াবে নবদ্বীপ পর্যন্ত।

* সব চেয়ে বড় কথা--বিপজ্জনক রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের জন্য ইউরোপে যে বিধিনিষেধ আছে, তার নাম 'রেজিস্ট্রেশন, ইভ্যালুয়েশন অ্যান্ড অথরাইজেশন অফ কেমিক্যাল' বা 'রিক'। আমেরিকায় আছে 'টক্সিক সাবস্টেনসেস কন্ট্রোল অ্যাক্ট।' এই সব বিধিনিষেধের জন্য ডাউ, দ্যুঁপ, মনসান্ত, সালেম ইত্যাদির লক্ষ্য হল তৃতীয় বিশ্ব। যেখানে সব ব্যাপারটা রয়েছে ঢিলেঢালা অবস্থায়। পশ্চি মী দুনিয়ার বিনিয়োগকারীরা পূর্বোক্ত বিধিনিষেধের কারণে এখন অন্যত্র রাসায়নিক শিল্প গড়তে চায়---নিজেদের দেশে তাদের অনেকে শাস্তি ভোগও করেছে---আদর্শ জায়গাটা হল আমাদের মতো দেশ।

এটা জানা কথা, পেট্রো রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার ওই সব দেশে আমাদের তুলনায় দশ গুণ বেশি। সুতরাং আমাদের মাটিতে এগুলো উৎপাদিত হয়ে বাইরে রপ্তানী হবে--তাদের পরিবেশ ঠিক থাকবে, দূষিত হবে এখানকার জলবায়ু। বিপন্ন হবে আমাদের প্রাণ।

মন্ত্রী-নেতাদের এতে লাভ বা আনন্দ থাকতেই পারে, কিন্তু আমরা ভুলে যাব ভূপালের কথা? বিদেশি ক্রেতা আর দেশের কিছু বিত্তবানের স্বার্থে পরিবেশ দূষণের মতো মারাত্মক ব্যাপারকে আমরা মেনে নেব? যে বিষাক্ত রাসায়নিক এবার ছড়িয়ে পড়বে, তা তেজস্ক্রিয় বর্জ্যের চেয়েও মারাত্মক বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন।

কেন্দ্রীয় সরকার অবশ্য সবুজ সঙ্কেত দিয়েছে — বুদ্ধ বাবুরা তাই আহ্লাদে আটখানা হয়ে গিয়েছেন। কংগ্রেস ও সি পি আই (এম) দলের মাখামাখির ফলেই এটা হয়েছে। কিন্তু এই দুটো দলই দেশ নয়—মানুষের স্বার্থ আরও অনেক বড় জিনিস। আর এস পি অবশ্য এই ভয়ঙ্কর ব্যাপারে চিন্তিত, কংগ্রেসের একটা অংশও। তৃণমূল এটা নিয়ে বিরাট আন্দোলনে নামবে বলে জানিয়েছে।

এই ব্যাপারে আরও বিচার-বিশ্লেষণ হোক। কিন্তু কংগ্রেস-মার্কসবাদীদের স্বার্থে রাজ্যটাকে বিপন্ন করতে দেওয়া কিছুতেই উচিত হবে না।

মোট কথা---জিওলজিক্যাল সার্ভে, কোস্টাল অথরিটি ইত্যাদির মত নেওয়া হোক আগে। জানানো হোক, কি ধরনের রাসায়নিক শিল্প করতে চায় উদ্যোগীরা। এই ব্যাপারে বিদেশী বিনিয়োগকারীদের নিজেদের দেশে দণ্ড ভোগ করতে হয়েছে কিনা। আর বিজ্ঞানী, পরিবেশবিদদের নিয়ে গড়ে তোলা হোক একটা প্যানেল--তাতে ঠিক হোক, সেখানে কৃষি-কাজ করাটাই সঙ্গত হবে কিনা।

"মন্ত্রী-নেতাদের এতে লাভ বা আনন্দ থাকতেই পারে, কিন্তু আমরা ভুলে যাব ভূপালের কথা? বিদেশী ক্রেতা আর দেশের কিছু বিত্তবানের স্বার্থে পরিবেশ দূষণের মতো মারাত্মক ব্যাপারকে আমরা মেনে নেব? যে বিষাক্ত রাসায়নিক এবার ছড়িয়ে পড়বে, তা তেজস্ক্রিয় বর্জ্যের চেয়েও মারাত্মক বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন।"

সেকাল-একালের নির্বাচন

শ্যামাপ্রসাদ দাস

এখন সেকাল-একালের নির্বাচন নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে নানারকম কৌতূহল দেখা যায়। কখনও-কখনও প্রধানের কাছে নবীনের প্রশ্ন, সেকালের নির্বাচন কেমন ছিল? ভোটার মানসিকতা এবং রাজনীতিকদের মানসিকতাই বা কেমন ছিল?

১৯৫১ সনের ১০ ডিসেম্বর শুরু হয় ভারতের প্রথম সাধারণ নির্বাচন। শেষ হল ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি। সেই ১৯৫১ সনের নির্বাচন আর ২০০৯-এর নির্বাচনের মধ্যে যথেষ্ট অমিল রয়েছে। এরাজ্যে প্রথম নির্বাচনে লোকসভার মোট আসন সংখ্যা ছিল ৩৪টি। এখন আসন সংখ্যা ৪২টি। এখন যেমন প্রতিটি নির্বাচন কেন্দ্রে একজন করে প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়, তখন কোথাও-কোথাও দুই থেকে তিনজন প্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়ার নিয়ম ছিল। যেমন ১ আসন বিশিষ্ট কেন্দ্র, দুই আসন বিশিষ্ট কেন্দ্রগুলো ছিল যথাক্রমে বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, বর্ধমান, বসিরহাট এবং ডায়মন্ডহারবার। তিন আসন বিশিষ্ট কেন্দ্র ছিল ১টি--উত্তরবঙ্গ।

প্রথম নির্বাচনে ৩৪টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস পেয়েছিল ২৪টি আসন। সিপিআই ৫টি, জনসংঘ ২টি এবং অন্যান্য ৩ জন নির্বাচিত হয়েছিল। জনসংঘের যে দু'জন নির্বাচিত হন, তাদের মধ্যে ছিলেন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্যান্য দলের যারা নির্বাচিত হয়েছিলেন, তাদের মধ্যে ছিলেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডঃ মেঘনাদ সাহা, কংগ্রেসের অতুল্য ঘোষ, সুরেন্দ্র মোহন ঘোষ, অনিল কুমার চন্দ, অরুণ গুহ এবং হিন্দু মহাসভার এন সি চ্যাটার্জি। আর ছিলেন সিপিআই নেত্রী শ্রীমতি রেণুকা চক্রবর্তী, কংগ্রেসের লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র এবং অন্যান্য বিশিষ্ট

ব্যক্তিগণ।

তখনকার নির্বাচনে এখনকার মতো দেওয়াল লিখন এবং নানা রঙের পোস্টার, ফেস্টুনের প্রচলন ছিল না; প্রচলন ছিল না একে অপরের বিরুদ্ধে নানারকম কুৎসা ছড়াবার রাজনীতি। নির্বাচন ঘিরে এখনকার মতো মার-দাঙ্গা, বুথজ্যাম, বুথ দখল, ছাপ্পা ভোট, প্রক্সি ভোটেরও প্রচলন ছিল না। নির্বাচন ছিল পরিচ্ছন্ন পরিবেশে-নাগরিক সচেতনতায় উৎসব মুখর। তবে মুসলিম সম্প্রদায়ের ভোট সেকাল-একাল চলছে একই নিয়মে। যেখানে মুসলিম প্রার্থী থাকে সেখানে তারা যেকোনও দলেরই হোক না কেন, ইমামদের নির্দেশে তারা অন্য কোনও সম্প্রদায়ের প্রার্থীকে ভোট দেয় না। অথচ অমুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন কোনও ভেদ ধারণা নেই। তারা তাদের পছন্দ মতো দলীয় প্রার্থীকেই ভোট দেয়। যাইহোক, নির্বাচন কমিশন নির্বাচন প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি ঠেকাতে সেকালের মতো একালেও নানারকম ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন। সেই ব্যবস্থা গ্রহণের ফলেই সেকালের বাক্স ভোট রূপান্তরিত হয়েছে--ইলেকট্রনিকস্ ভোটে।

প্রথম নির্বাচনে খুব কম প্রার্থী ছিলেন যাঁদের প্রচারে মোটরগাড়ি ব্যবহার হতো। অধিকাংশ প্রার্থী দলীয় কর্মীদের সঙ্গে হাঁটাপথে ভোটারদের বাড়ি-বাড়ি গিয়ে তাদের শুভেচ্ছা কামনা করতেন। এমনকী দলের সর্বভারতীয় নেতাগণও প্রচার অভিযানে এসে হেঁটে গিয়ে ক্লাব ঘরে বসে ক্লাব সদস্যদের সহযোগিতা কামনা করতেন। এক্ষেত্রেও অমুসলিমদের মধ্যে কোনও সাম্প্রদায়িক ভেদ-ভাবনা ছিল না। তারা মুসলিম গ্রামেও যেতেন তাদের সমর্থন পাওয়ার জন্য;কিন্তু একালের মতো সেকালেও মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে দুটো গোষ্ঠী নির্বাচনে সক্রিয় ছিল। এক গোষ্ঠী সামন্ততান্ত্রিক ভাবাবেগে ভোট বয়কট করে থাকেন। অন্যগোষ্ঠী সেকাল-একালে মিশ্র ভাবাবেগে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে ও অমুসলিম এলাকাগুলোতেপ্রচার অভিযানে যেতে সংশয় বোধ করেন।

পশ্চিমবঙ্গে প্রথম লোকসভা নির্বাচনে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার

পশ্চিমবঙ্গে প্রথম লোকসভা নির্বাচনে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার ফি ছিল ৫০০ টাকা। তখন ৩৪টি আসনের জন্য মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছিলেন ১৪৮ জন প্রার্থী। প্রত্যেকের নির্বাচনে খরচের সর্বোচ্চ সীমা ছিল ২৫ হাজার টাকা। যা একালের নির্বাচনের প্রচার অভিযানের এলাহি কাণ্ড কারখানার সঙ্গে মোটেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

ফি ছিল ৫০০ টাকা। তখন ৩৪টি আসনের জন্য মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছিলেন ১৪৮ জনব্দ প্রার্থী। প্রত্যেকের নির্বাচনে খরচের সর্বোচ্চ সীমা ছিল ২৫ হাজার টাকা। যা একালের নির্বাচনের প্রচার অভিযানের এলাহি কাণ্ডকারখানার সঙ্গে মোটেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। সেকালে এখনকার মতো পথে-ঘাটে মাঠে জনসভার জন্য মাইকের ব্যবহার ছিল না। মুখে চোঙা লাগিয়ে হাটে-বাজারে প্রচার করা হতো। জনসভাতেও চোঙা ব্যবহার হতো।

প্রথম নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে মোট ভোটার সংখ্যা ছিল ১ কোটি ২৪ লক্ষ ৮৯ হাজার ২৭০ জন। এবার এই ২০০৯ সনের নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে ভোটার সংখ্যা ৫ কোটি ২৩ লক্ষের ওপরে। ভোট শুরু হবে ১৬ এপ্রিল। ভোট শেষ হবে ১৩ মে। ভোট গণনা হবে ১৬ মে। ভোট হবে তিন ভাগে। প্রথম ভোট হবে ৯টি জেলার ১৪টি আসনের। দ্বিতীয় দফায় ভোট হবে ৭টি জেলার ১৭টি আসনের জন্য। তৃতীয় দফায় ভোট হবে ৩ জেলার ১১টি আসনের। এভাবেই সারা ভারতের ভোটগ্রহণ হবে বিভিন্ন প্রদেশে মোট পাঁচ দফায়।

এখন দেখা যাক বর্তমান বিশ্বের সন্ত্রাসবাদী পরিমণ্ডলে ভারতের নির্বাচন কতটা শান্তিপূর্ণ হয়। কারণ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের একদিকে ওতপ্রোতভাবে আছে নকশাল সন্ত্রাসবাদ, অন্যদিকে ইসলামিক সন্ত্রাসবাদ। এই দুটোই গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে সবসময় সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে।

মমতাকে বাগে আনতেই জোট

(১ পাতার পর)

ইউ পি এ-এর বড় শরিক কংগ্রেসকে সিপিএমের খবরদারি সহ্য করতে হচ্ছে। তাই তাঁর লক্ষ্য বামফ্রন্টকে দুর্বল করা যাতে সিপিএমকে কংগ্রেসের ওপর নির্ভর করতে হয়।

কংগ্রেস সি পি এমের এই রাজনৈতিক পাশা খেলায় মমতা হচ্ছেন তুরুপের তাস। মমতাকে সঙ্গে পাওয়া এখন সোনিয়ার তাই একান্ত প্রয়োজন।

সোনিয়া গান্ধীর দ্বিতীয় লক্ষ্য প্রণব মুখার্জীকে দুর্বল করা। সোনিয়া গান্ধী আগামী দিনে রাহুল গান্ধীকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চান। এ কাজে প্রধান বাধা প্রণব মুখোপাধ্যায়। সিপিএমের সহায়তা ছাড়াই কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকার গঠন করতে সক্ষম হলে সেক্ষেত্রে স্বার্থসিদ্ধির জন্য কংগ্রেস বা মন্ত্রিসভার ওপর যথেষ্ট চাপ সৃষ্টি করতে পারে এমন কোনও লবিই প্রণববাবুর থাকবে না। একমাত্র সিপিএমের জোরেই তিনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রধানমন্ত্রী এবং সোনিয়া গান্ধীর ওপর মাতববরি করতে পারেন। সিপিএম শক্তিহীন হলে প্রণব বাবুর শক্তিহীন অবস্থা হবে। তাই সিপিএমকে শক্তিহীন করতে মমতাকে প্রয়োজন।

একমাত্র মমতাই নিজেকে নিজে শেষ করতে পারেন। নিজের পায়ে কেউ যদি নিজেই কুড়ুল মারতে ভাল পারেন সে হল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যে কংগ্রেস রাজ্য থেকে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল, সেই কংগ্রেসকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন মমতা এন ডি এ জমানায় রেল মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করে। আজ আবার কংগ্রেসের রাজনৈতিক শক্তি বাড়াচ্ছেন ভুল চাল দিয়ে।

বিজেপির আসন বাড়ছে ঝাড়খণ্ডে

(১ পাতার পর)

এদিকে বিজেপি এই সমস্ত বড় নির্বাচনী ক্ষেত্রগুলিতে স্থানীয় সংগঠনগুলিকেও বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের ধারণা এতে দলের সমর্থনের ভিত্তি প্রসারিত হবে। এল কে আদবানীও ঝাড়খন্ডে এসে দলীয় কর্মীদের উৎসাহ জুগিয়ে গেছেন।

বিজেপির অর্জুন মুন্ডা নির্বাচনে আগে থেকে ভালো ফল করার বিষয়ে যথেষ্ট আশাবাদী। ইউপিএ শত রণকৌশল ঠিক করলেও, তাঁরাই জয়ী হবেন বলে তিনি এক বিবৃতিতে জানান।

ইউপিএ তফসিলি ও খৃস্টানদের ভোটের ওপর বেশি নির্ভর করলেও, এবারের নির্বাচনে তাদের ভোট ভাগ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বিজেপি যে সমস্ত প্রার্থীকে দাঁড় করাচ্ছে তাতে তফসিলি ভোটের একটা বড় অংশ ইউপিএ-র হাতছাড়া হতে পারে।

দেখা মাত্র গুলির নির্দেশ

(১ পাতার পর)

কয়েক মাসে সীমান্তে বি এস এফের হাতে বেশ কিছু অনুপ্রবেশকারী মারা যায়। তারা সে সময় সীমান্ত পেরিয়ে এদেশে ঢোকার চেষ্টা করছিল। অনুপ্রবেশকারী দেখা মাত্র গুলি করে মারার নির্দেশের সঙ্গে যে সব জওয়ান বাংলাদেশীদের জীবিত কিংবা মৃত ধরে ফেলছে তাদের পুরস্কৃত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। গত কয়েকমাসে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে মোতায়েন বেশ কয়েকজন জওয়ান এজন্য পুরস্কৃত হয়েছে। বিএস এফ সূত্রে জানা গিয়েছে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ ঠেকাতে পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তে এই নীতি বহাল থাকবে। কারণ, এর জেরে স্রেফ অনুপ্রবেশই নয়, চোরাচালানও অনেকটা আটকানো সম্ভব হচ্ছে।

বি এস এফ সূত্রে জানা গিয়েছে, দেখা মাত্র গুলি করা ছাড়া অন্য কোনও নীতি কাজ করছিল না। অনুপ্রবেশ বাড়ছিল। সেই কারণেই অনুপ্রবেশকারী দেখলেই গুলি করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে তথ্য প্রমাণ হিসাবে বেশ কিছু জিনিসও কাজে লাগাচ্ছে বিএসএফ। বাংলাদেশের হাতে ওই মৃতদেহ তুলে দেওয়ার জন্য এই প্রমাণ কাজে লাগছে। যেমন বাংলাদেশী নোট, অনুপ্রবেশকারীর পরনের জামা-কাপড়ে বাংলাদেশের দর্জি-দোকানের ট্যাগ বা লেবেল এবং মোবাইল ফোন বা ডায়েরি। যা বাংলাদেশেই ব্যবহার হয়। বি এস এফ কর্তারা বলেছেন, অনেকক্ষেত্রে এরপরও বাংলাদেশ সরকার অনুপ্রবেশকারীদের মৃতদেহ ফেরৎ নিতে চাইছেনা। তখন স্থানীয় পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় নেই বলে জানিয়েছেন তারা। বি এস এফের এই নীতির ফলে অনুপ্রবেশ কি বন্ধ হয়ে গিয়েছে? বি এস এফ কর্তারা বলেছেন, অনুপ্রবেশ ও চোরাচালান সম্পূর্ণ বন্ধ হয়নি। কারণ এখনও প্রায় ৭০০ কিলোমিটার সীমান্তে কাঁটা তারের বেড়া দেওয়া যায়নি। তবে গত ছ'মাসে অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা অনেকটা কমেছে।

রাজ্য রাজনীতি

ইতিহাসের কী নির্মম পরিহাস — সোমেন মিত্র তৃণমূল প্রার্থী

নিশাকর সোম

দীর্ঘদিন ধরে টানা-হেঁচড়ার পর তৃণমূল-কংগ্রেস জোটের জট খুলে প্রার্থী ঠিক হল। তৃণমূল ২৮ এবং কংগ্রেস ১৪---তৃণমূল-এর দেওয়া এই আনুপাত মেনে নিলেন সোনিয়া গান্ধী। আসলে কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কেন্দ্রে পুনরায় ক্ষমতায় ফিরে আসা নিয়ে সন্দিহান হয়ে যে-কোনও মূল্যে নির্বাচনী-সঙ্গী বেছে ভোট বৈতরণী পার হতে চাইছে।

এ রাজ্যেও কংগ্রেসের অবস্থা তথৈবচ। রাজনীতি-ইতিহাসের কী নির্মম পরিহাস---যে সোমেন মিত্র প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচনে মমতা ব্যানার্জিকে হারিয়ে দেওয়ার ফলেই মমতা ব্যানার্জি ''তৃণমূল'' গঠন করলেন, সেই সোমেন মিত্র আজ মমতা ব্যানার্জির করুণাতে লোকসভায় ডায়মন্ডহারবারে প্রার্থী হতে চলেছেন। যে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বিধানসভার শিল্প সংক্রান্ত স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম ঘটনায় সরকারের পাশে ছিলেন, তিনি আজ এই নীতিরই বিরোধিতা করে উত্তর কলকাতায় তৃণমূল প্রার্থী হিসাবে লড়বেন। নির্বাচন অতি বিষম বস্তু। তাই এসইউসি-কে জয়নগরের সিটটি তৃণমূল সুপ্রিমো ছেড়ে দিয়েছেন। বস্তুত তৃণমূল-কংগ্রেস-এস ইউ সি আই ঐক্য গড়ে উঠল। নির্বাচনের পর এর সঙ্গে যোগ হবে সিপিএম---বামদলগুলি?

তবে জোট বাঁধার কৌশল দেখতে দেখতে মনে হয়েছে কংগ্রেস যেমন ''বন্ধু'' খুঁজে বেড়াচ্ছে, তেমনি সিপিএম-ও যেনতেন প্রকারেণ অন্য রাজ্য থেকে সাংসদ পেতে মরিয়া হয়ে উঠেছে। কারণটা খুবই স্পষ্ট। কেরলে সিপিএম-এর দলাদলির ফলে সিট কমে যাবে। পশ্চিমবঙ্গের অবস্থাও তাই। সদ্যসমাপ্ত সিপিএম-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় সদস্যরা পশ্চিমবঙ্গের পার্টি নেতৃত্বের তীব্র সমালোচনা করে পশ্চিম-বঙ্গকে সাংসদ সংখ্যা ধরে রাখার চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে। লোকসভার নির্বাচনের পর---পশ্চিমবঙ্গের সিপিএম নেতৃত্বের অনেককেই নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে। সিপিএম-এর কলকাতার দুটি সিটেই হারার সম্ভাবনা। দক্ষিণ কলকাতায় মমতার বিরুদ্ধে গতবারের পরাজিত প্রার্থী রবীন দেব-কেই দাঁড় করানো হয়েছে। যে রবীন দেব বিগত বিধানসভা নির্বাচনে পরাজিত হয়েছিলেন। সিপিএম-এর কী অবস্থা---একজন মহিলা তাদেরকে কোণঠাসা করে দিয়েছেন। বুদ্ধ বাবুর ২৩৫-এর হুংকার বেড়ালের ম্যাও-ম্যাও ডাকে পরিণত হয়েছে। দাম্ভিক বুদ্ধ বাবুর কপালে আরও দুঃখ অপেক্ষা করছে। তিনি আগামী বিধানসভা নির্বাচনেও হেরে যাবেন। সিপিএম-এর এমনই দুর্দশা যে, মমতার বিরুদ্ধে কোনও মহিলা প্রার্থীই দিতে পারেনি। এর কারণ তাদের দলের মহিলা নেত্রীর গ্রহণযোগ্যতা কমিটির মধ্যেই নেই। বনানী বিশ্বাস, শ্যামলী গুপ্ত অবিভক্ত পার্টিতে সাধারণ ব্রাঞ্চ সদস্য ছিলেন, এখন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য!

যা হোক, দক্ষিণ কলকাতা কেন্দ্রের জন্য সিপিএম-এর কলকাতা জেলা কমিটি এক বিরাট পার্টি নির্বাচনী কমিটি গঠন করেছে, যার আহ্বায়কের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বেহালার নিরঞ্জন চ্যাটার্জিকে, যিনি বিগত বিধানসভা নির্বাচনে পরাজিত হয়েছিলেন। আর উত্তর কলকাতা কেন্দ্রের জন্যও এক বিরাট কমিটি গঠন করা হয়েছে---যার আহ্বায়ক হয়েছেন রাজদেও গোয়ালা---যিনি বিগত বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থীর নিকট শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছিলেন!! সিপিএম তো মমতার সিটটাকে আগেই খরচের খাতায় ফেলেছে। এখন নতুন উত্তর কলকাতা কেন্দ্রের বিধানসভা সেক্টরের ভোটের গাণিতিক যোগ-বিয়োগ দেখা যাচ্ছে সিপিএম পিছিয়ে আছে। এর উপর আবার সিপিএম-এর কলকাতা জেলা কমিটি প্রার্থী মহঃ সেলিমের ওপর বিরক্ত। সেলিম কলকাতা জেলা কমিটির তোয়াক্কা করেন না। তাঁর কিছু লোকজন আছেন, যাঁরা নির্বাচনে মাতববরি করে থাকেন। সেটা কলকাতার সিপিএম-এর নেতারা সহ্য করতে পারেন না। এর ওপর দক্ষিণের সমস্ত লোকাল কমিটিতে আড়াআড়িভাবে দু'টি গ্রুপ কাজ করছে। একই অবস্থা মেদিনীপুরের সিটগুলিতেও।

মমতা

তাই দমদম কেন্দ্রে সুভাষ চক্রবর্তীর হস্তক্ষেপ সরাতে তাঁকে লক্ষ্মণ শেঠের কেন্দ্রে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। লক্ষ্মণ শেঠও আর একজন সুভাষ চক্রবর্তী। সুভাষ চক্রবর্তী সস্ত্রীক শান্তিনিকেতনে দোল উৎসব করে বেড়াচ্ছেন। তিনি বোধহয় তারাপীঠে তাঁর প্রিয়জনের পাঁচতারার মতো হোটেলটাতেও ঘুরে আসবেন। এই হোটেল-বিহারকে চাপা দেওয়ার জন্যই সুভাষবাবু---তারাপীঠে পুজো দিয়ে জনমতকে ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন। সুভাষবাবুর শ্রীকৃষ্ণ 'লিডার অফ দ্য লিডার' জ্যোতি বসু বলেছিলেন, সুভাষ বুড়ো হয়ে ভয় পাচ্ছে?

সিপিএম রাজ্য নেতৃত্বের আতঙ্ক---নীচের তলার কর্মীরা নির্বাচকমণ্ডলীর সঙ্গে মোকাবিলা করতে ভয় পাচ্ছে। তাঁরাও সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম শিল্পনীতি নেতার উদ্ধত বক্তব্য নিয়েও বিরক্ত ও সমালোচনায় মুখর।

শুধু সিপিএম নয়, ফরওয়ার্ড ব্লক---আর এস পি-তেও একই অবস্থা। আরএসপি-তে ক্ষিতি গোস্বামীর বিরুদ্ধে প্রার্থীরা সরব। তাঁরা বলছেন, ক্ষিতিবাবুর জন্য সিপিএম কর্মীরা তাঁদের জন্য কাজ করতে চাইছেন না। তেমনি আরএসপি-এর নীচের তলার কর্মীদের মধ্যে প্রার্থী নিয়ে কোন্দলের শেষ নেই।

ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রধান নেতা অশোক ঘোষ তো বিমান বসুর সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়েছেন---কারণ জিততে হবে।

তবে মনে করবার কোনও কারণ নেই যে---তৃণমূলে কোনও ''যদি-কিন্তু-তবে-এটা ঠিক ঠিক''---এই কথাগুলি বন্ধ থাকবে না। কারণ তাপস পাল বিধায়ক আবার। সেইসঙ্গে লোকসভার প্রার্থী। তৃণমূলের নেতৃত্বের মধ্যে কি প্রার্থী ছিল না? সুদীপ ব্যানার্জি কংগ্রেস ছেড়ে দৌড়ে তৃণমূলে এলেন---তিনিও প্রার্থী হলেন। অথচ একই কেন্দ্রে সাধন পাণ্ডের মতো নেতা আছেন। যেহেতু তিনি মমতার ''ইয়েসম্যান'' নন, তাই তিনি কোণঠাসা।

সোমেন

একটা কমিটির সামান্য সদস্য মাত্র।

কংগ্রেস-এর অভ্যন্তরীণ অবস্থা কংগ্রেসেই আছে---অর্থাৎ চিরাচরিতভাবে কে আগে দাঁড়াইবে তার লাগি ঝগড়া-ঝগড়ি, লাটা-লাঠি। নীচের তলার কংগ্রেস কর্মীরা সোমেন মিত্র এবং সুদীপ ব্যানার্জি-এর হয়ে মনেপ্রাণে কাজ করবেন কি? তাঁরা তো তাঁদের মনের মতো কেন্দ্রে চলে যেতে শুরু করেছেন। কংগ্রেসের মধ্যে নাকি অন্তর্ঘাত হয়ে থাকে?

সিপিএম তো নেতিবাচক প্রচারে ব্যস্ত---''রাজ্যভাগ করার চক্রান্তের বিরুদ্ধে---ভোট দিন'' বলেই কাজ সারছে। শিল্পায়ন বা সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম নিয়ে একটি শব্দও খরচ করছেনা।

তৃণমূল আর কংগ্রেসের জোট-এর একটি আওয়াজ --- ''সিপিএম-এর অপশাসনের বিরুদ্ধে ভোট দিন।''

আদর্শগত-নীতিগত-জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিসুলভ কোনও কর্মসূচী এখন কংগ্রেস বা তৃণমূল জনগণের সামনে পেশ করেনি।

অন্য রকম

পৃথিবীটা বড় রঙিন

নিজস্ব প্রতিনিধি।। আপনার আমার কাছে সিনেমার জগৎটা বড়ই রঙিন। শুধু তাই বা বলি কেন, আর পাঁচ জনের কাছেও তাই। আজ থেকে ২০ বছর আগে তার কাছেও সিনেমার জগৎটা ছিল অজানা। মাত্র ১২ বছর বয়সে সিনেমায় কাজের সুযোগ পাওয়াটা তার কাছে হাতে চাঁদ পাওয়ার মতোই মনে হয়েছিল।

দিল্লীর ফুটপাথের শাফিক সৈয়দ ১১ বছর ১১ মাস আগে পর্যন্ত স্বপ্নেও ভাবেনি সে ছবিতে অভিনয় করবে। জন্মের পর থেকেই খোলা আকাশের নীচে বড় হয়েছে সে। একেবারে চালচুলোহীন। ১২ বছর বয়সে একদিন হঠাৎ পরিচয় হয় এক নাট্যগোষ্ঠীর একজন মহিলার সঙ্গে। তিনিই অভাবের দাম ২০ টাকা রোজে কিনে নিয়েছিলেন সৈয়দের কাছ থেকে। দৈনিক ২০ টাকার বিনিময়ে শাফিক ওই নাট্যগোষ্ঠীতে যোগ দেয়। বন্ধুরা অনেকে বারণ করেছিল তাকে। এসবের পিছনে অন্য গন্ধও পেয়েছিল তারা। তবে শাফিক সেসবে কর্ণপাত করেনি। তার মতো শতাধিক বস্তির ছেলে ওই গোষ্ঠীতে যুক্ত ছিল। শাফিকও তাদের মধ্যে একজন। শাফিকের চোখে মুখে কত না স্বপ্ন।

কপালের গুণে বড় সিনেমায়

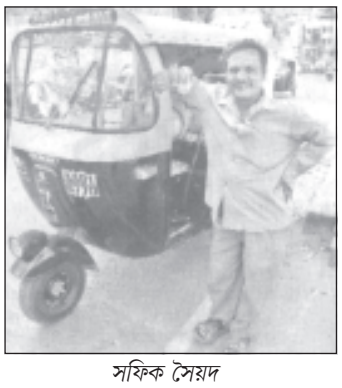

সফিক সৈয়দ

অভিনয়ের সুযোগ আসে তার। 'সেলাম বোম্বাই' সিনেমায় অভিনয় করে শাফিক। 'সেলাম বোম্বাই'-এর কৃষ্ণাই সেই শাফিক, যার অভিনয় এখনও অনেকে মনে রেখেছে। প্রথাগত অভিনয় বিদ্যা না থাকলেও, জীবনের বাস্তবের রসদ থেকে 'কৃষ্ণা' চরিত্রটিকে ফুটিয়ে তুলেছিল। ছবিটি সৌভাগ্যক্রমে অস্কারের জন্য মনোনীতও হয়েছিল। তবে এসবই আজ অতীত। মুছে যাওয়া দিন। আপনি হয় তো ভাবছেন শাফিক এখন কোনও বড় অভিনেতা। ঋত্বিক, শাহরুখ, বা অভিষেকের মতোই আছেন। কিন্তু না। এমন কিছুই সে হতে পারেনি। এই ব্যর্থতা তার নয়। ব্যর্থতা পরিকাঠামোর। তার মতো অভাবীদের সাময়িক অভিনয়ের জন্য কেনা হয়।

আজ সে একজন সামান্য অটো চালক। ব্যাঙ্গালোরে অটো চালায়। দৈনিক রোজগার ১৫০ টাকা। এমনটা হল কেন? প্রশ্নটা করাতেই গলাটা গম্ভীর হয়ে উঠেছিল তার। 'ওসব অতীত দাদা, স্বপ্নের দিন ছিল সেগুলি' তার এই একটা কথাতেই বুঝে গেলাম সত্যিই সে জগৎ বড় রঙিন। স্লামডগ মিলিওনেয়ারেও অনেক বস্তির ছেলে কাজ করেছে। তাদের যাতে এই দশা না হয় ভগবানের কাছে সে এখন এই প্রার্থনাই করে। শাফিক তার নিজের জীবন দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে বাস্তব বড় কঠিন।

কোর্টে আসামীর স্বীকারোক্তি

খালেদা জিয়া সরকারই উলফাকে অস্ত্র দিয়েছে

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ বাংলাদেশে বসেই উলফা নেতা পরেশ বড়ুয়া চট্টগ্রামে দশ ট্রাক অস্ত্র আনলোডের তদারকি করেছিলেন। এজন্য তিনি চোরাচালানীকে নগদ ৫০ লাখ টাকা হস্তান্তর করেছেন। এ ব্যাপারে সহযোগিতা করেছেন তৎকালীন জোট সরকারের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর। মামলার প্রধান আসামী আন্তর্জাতিক চোরাকারবারী দলের সদস্য হাফিজুর রহমান ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবাববন্দী

খালেদা জিয়া

হাফিজ বলেছে, ১০ ট্রাক অস্ত্র আনানো সম্পর্কে তৎকালীন সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, গোয়েন্দা সংস্থাসহ সবাই অবগত ছিল।

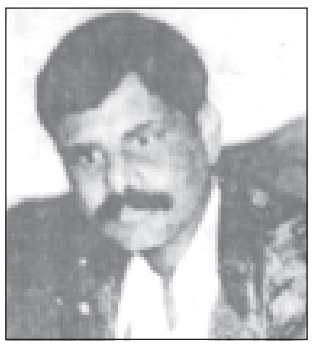

পরেশ বড়ুয়া

প্রদানের মধ্য দিয়ে এসব অস্ত্রের উৎস, গন্তব্য এবং হোতা সম্পর্কে আদ্যোপান্ত বিবরণ দিয়েছে আদালতের কাছে।

সি আই ডি দু'দফায় ৯ দিনের রিমান্ডে নিয়ে হাফিজ ও অপর আসামী দীন মহম্মদকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। জিজ্ঞাসাবাদে মূলত প্রধান আসামী হাফিজই ১০ ট্রাক অস্ত্রচালান সম্পর্কে চাঞ্চল্যকর সব তথ্য প্রদান করে। এতে হাফিজ বলেছে, ১০ ট্রাক অস্ত্র আনানো সম্পর্কে তৎকালীন সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, গোয়েন্দা সংস্থাসহ সবাই অবগত ছিল। কোস্টগার্ডের জাহাজের পাহারায় এসব অস্ত্র বন্দর চ্যানেলে প্রবেশ করে কর্ণফুলীর দক্ষিণ তীরে সিইউএফএল ঘাট পর্যন্ত পৌঁছায় এবং আনলোড করা হয়। ভারতীয় বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন উলফার জন্যই এসব অস্ত্র আনা হয়। উলফা নেতা পরেশ বড়ুয়া বাংলাদেশে বসেই পুরো অস্ত্র চোরাচালান খালাস কার্যক্রম তদারকি করে। এই অস্ত্র যাতে নির্বিঘ্নে আনা যায় সেজন্য তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেনের দপ্তর বদল করে তাকে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবরই এই মন্ত্রণালয়ের সর্বেসর্বা হয়ে অস্ত্র চালানে সার্বিক সহায়তা প্রদান করেন। তাছাড়া শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন সি ইউ এফ এল জেটিঘাটে নির্বিঘ্নে অস্ত্র খালাসের কাজে ব্যবহার করার সুবিধার্থে ঘটনার রাতে সি ইউ এফ এল রেস্ট হাউসে অবস্থান করছিলেন তৎকালীন শিল্প সচিব নুরুল আমিন।

তবে সি এম পি পুলিশকে না জানিয়ে গোপনে চট্টগ্রামকে রুট হিসেবে ব্যবহার করে অস্ত্র পাচার করতে গিয়েই বিপত্তি ঘটে বলে জিজ্ঞাসাবাদে হাফিজ জানিয়েছে। যখন পুলিশ সি ইউ এফ এল জেটিঘাটে তাকে অস্ত্র খালাসের সময় আটক করে, তখন পুলিশকে ম্যানেজ করার চেষ্টা করেছিল হাফিজ। কিন্তু পুলিশ আগে থেকে বিষয়টি না জানায় এবং তাদের ম্যানেজ করতে না পারায় শেষ পর্যন্ত অস্ত্র চালানটি ধরা পড়ে যায়। রিমান্ডে সি আই ডি কর্মকর্তাদের জিজ্ঞাসাবাদে যেসব কথা হাফিজ বলেছে, গত ৯ মার্চ আদালতে প্রদত্ত ১৬৪ ধারার জবানবন্দীতেও সেসব কথার পুনরাবৃত্তি করেছে বলে নিশ্চিত করেছে সি আই ডি'র ওই সূত্র।

ওইদিন সকালে কঠোর নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে ১০ ট্রাক অস্ত্র মামলার দু-আসামী হাফিজ ও দীন মহম্মদকে চট্টগ্রাম আদালতে আনা হয়। দুই প্লেটুন পুলিশ ও দুটি এস্কর্ট টিম ছাড়াও সি আই ডি, এস বি, কোতোয়ালি থানার ওসি'র নেতৃত্বাধীন বিশেষ টিম আদালত ভবনে অবস্থান নেয়। বেলা দেড়টায় হাফিজ ও দীন মহম্মদকে বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট ও হেলমেট পরিয়ে আদালতে আনা হয়। দু'আসামী মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মহম্মদ ওসমান গনির আদালতে ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী প্রদান করে। ম্যাজিস্ট্রেটের কামরায় দুপুর ২টা থেকে বিকাল পৌনে ৫টা পর্ড়ন্ত প্রায় পৌনে তিন ঘণ্টা জবাববন্দী দেয় দু'আসামী। এর মধ্যে হাফিজুর রহমানের বক্তব্য ২০ পৃষ্ঠায় এবং দীন মহম্মদের ২ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করা হয়।

লস্কর-এ-তৈবার নতুন নাম তানজিম-এ-মহম্মদী

পুলিশী হেফাজতে ধৃত লস্কর জঙ্গি আবু তাহের।

নিজস্ব প্রতিনিধি।। সেই বাংলাদেশকেই কেন্দ্র করে লস্কর-এ-তৈবা নতুন নামে কাজ শুরু করে দিয়েছে। প্রধান লক্ষ্য হল উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সন্ত্রাস ও অস্থিরতা জিইয়ে রাখা। এর নতুন নাম হল—তানজিম-এ-মহম্মদী। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে-সঙ্গে বাংলাদেশের লাগোয়া পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলোতেও এই সংগঠন মুসলমান যুবকদের মাধ্যমে জেহাদি কাজ-কারবার চালিয়ে যেতে চায়। সম্প্রতি কলকাতায় ধৃত লস্কর-এর চাঁই এবং বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ আবু তাহেরকে জেরা করে একথা জানা গেছে। উল্লেখ্য, গত ৬ মার্চ কলকাতায় পুলিশের স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্সের হাতে আবু তাহের ও তার এক সঙ্গী, মুর্শিদাবাদ জেলার সূতি থানা এলাকার বাসিন্দা আব্দুল সাদিক ধরা পড়ে। পাকিস্তানভিত্তিক জেহাদি সংগঠন লস্কর-এ-তৈবার উঁচুদরের কর্মী আবদুল করিম তুণ্ডার নির্দেশে কলকাতায় সাংগঠনিক জাল বিস্তার ও ক্যাডার সংগ্রহে এসেছিল। পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, শুধু মুম্বাইতে ২৬।১১ নয়, গত কয়েক বছরে ভারতবর্ষে যেসব সম্প্রদায়িক হামলা হয়েছে তার বেশিরভাগ ঘটনাতেই আবু তাহেরের যোগাযোগ ছিল। তার তৈরি করা বিস্ফোরক ভারতের বিভিন্ন জায়গায় সে নিয়মিত তার এজেন্টদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে। এস টি এফ-সূত্রে জানা গেছে, তাহের কমপক্ষে ৩০ জন মুসলমান যুবককে সন্ত্রাসবাদী প্রশিক্ষণ নিতে বাংলাদেশ ও পাকিস্তান পাঠিয়েছিল। বেশ কিছুদিন সে উত্তর দিনাজপুরে এক মাদ্রাসায় কাজ করেছে। বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে তার নিয়মিত যাতায়াত ছিল। তার কাছে বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানের পাসপোর্টও পাওয়া গেছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। ভারত ছাড়া বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে তার ঘর-সংসার রয়েছে। গোয়েন্দাদের নজর এড়াতে সে মাদ্রাসার কাজ ছেড়ে গা-ঢাকা দিয়েছিল। তাহের নিয়মিতভাবে উত্তর ২৪ পরগণা, কুচবিহার, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ এবং নদীয়া থেকে বাছাই করা মুসলমান যুবকদের জেহাদি প্রশিক্ষণে পাঠাত।

অসমে অগপ-বিজেপি জোট চূড়ান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি।। সবরকম ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটিয়ে শেষ পর্যন্ত অগপ-বিজেপি আসন সমঝোতা চূড়ান্ত হয়ে গেল। অগপ রাজ্য সভাপতি এবং অসম বিধানসভার বিরোধী দলনেতা চন্দ্রমোহন পাটোয়ারি, বি জে পি-র সর্বভারতীয় সভাপতি রাজনাথ সিং এবং এন ডি এ-এর প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী লালকৃষ্ণ আদবানী দু-পক্ষের আসন ভাগাভাগির চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। এর ফলে অসমের ১৪টি লোকসভা আসনে শাসকদল কংগ্রেস এক জোরদার প্রতিপক্ষের সম্মুখীন হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ এবারের নির্বাচনে এই জোটকে একটা 'ফ্যাক্টর' বলে স্বীকার করেছেন। অগপ-অসম গণ পরিষদ লোকসভার ভোটে বি জে পি-কে বড় ভাইয়ের সম্মান দিয়ে চৌদ্দটির মধ্যে মাত্র ছয়টি আসনে প্রার্থী দাঁড় করাবে। আবার ২০১১ সালের রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে স্থানীয় দল হিসেবে অগপ অনুরূপ মর্যাদা পাবে। সেক্ষেত্রে জোট ঘোষণা না হলেও, ২০১১ পর্যন্ত জোটই হয়ে গেল বলে ধারণা করে নেওয়া অসমীচীন হবে না। ৫ মার্চ আসন সমঝোতা পাকাপাকি হয়। তার আগে পর্যন্ত কিছুটা ধোঁয়াশা থাকলেও এদিন তা পরিষ্কার হয়ে যায়। তখনই দু-দলের শীর্ষ নেতারা যৌথভাবে সাংবাদিক সম্মেলন করেন।

টানাপোড়েন চলছিল গুয়াহাটি লোকসভা কেন্দ্র নিয়ে। কেন্দ্রটির প্রতি উভয় দলের তাবড় নেতা-নেত্রীদের নজর ছিল। শেষ অবধি শর্তসাপেক্ষে অগপ বি জে পি-কে আসনটি ছাড়তে রাজী হয়। সেখানে বিজেপি দলের এক কেন্দ্রীয় নেত্রীকে প্রার্থী করবে না বলে কথা দেয়। তাতেই জট ছেড়ে যায়। রাজ্যের চৌদ্দটি লোকসভা আসনের মধ্যে বিজেপি প্রার্থী দেবে—গুয়াহাটি, ধুবড়ি, মঙ্গলদৈ, নওগাঁ, দিফু, জোড়হাট, শিলচর এবং করিমগঞ্জ কেন্দ্রে। আর অগপ প্রার্থী দেবে---লখিমপুর, ডিব্রুগড়, কালিয়াবর, তেজপুর, বরপেটা এবং কোকরাঝাড় কেন্দ্রে।

অগপ-বিজেপি নেতৃবৃন্দ

২০১১ সালে বিধানসভা নির্বাচনের সময় যেসব আসনে অগপ দলের প্রার্থীরা ১৯৮৫ ও ১৯৯৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী হয়েছিলেন সেখানে বিজেপি প্রার্থী দেবে না। চন্দ্রমোহন পাটোয়ারি ছাড়াও অগপ দলের কার্যকরী সভাপতি ফণীভূষণ চৌধুরী এবং সংযুক্ত জনতা দলের শীর্ষনেতা শরদ যাদব সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। আদবানীজী বলেন, সম্পূর্ণ উত্তর-পূর্বাঞ্চলে এই সমঝোতার ফল সুদূরপ্রসারী এবং এন ডি এ-র পক্ষে লাভদায়ক। চন্দ্রমোহন পাটোয়ারি বলেন, এই জোট অসমে কংগ্রেসের অপশাসনের সমাপ্তি ঘটাবে। অসমে উভয় দলের কর্মীরা জোটের ফলে উৎসাহিত। অদূর ভবিষ্যতে গুয়াহাটিতে যৌথ নির্বাচনী জমায়েত বিশাল আকারে হবে বলেও জানা গেছে।

ভোটের মুখে রাজ্যে রাজ্যে প্রতিশ্রুতির বন্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। ভোটের সময়ই শুধু নেতা-নেত্রীদের মধ্যে কর্মব্যস্ততা নজরে পড়ে। ভুরি-ভুরি প্রতিশ্রুতির বন্যাও বইয়ে দেন তারা। ভোটদাতাদের চমক দেওয়ার জন্য রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে একটা মিশ্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়ে যায়, ভোটের ঢাকে কাঠি পড়লে। সব রাজ্যেই এই চিত্রটা খুব পরিষ্কার। যে সব রাজ্যের ক্ষমতাসীন দলগুলি ভোটের আগে প্রতিশ্রুতি ও গৃহীত প্রস্তাবে রেকর্ড করেছে তাদের কয়েকটি এখানে তুলে ধরা হল---

পশ্চিমবঙ্গ ঃ

বত্রিশ বছর ধরে চলা সি পি এম নেতৃত্বাধীন বামপন্থী জোট সরকারের প্রতিশ্রুতি —

* বি পি এল-দের জন্য ২ টাকা কেজি দরে চাল বিতরণ।

* মহাবিদ্যালয়ে ৬০ হাজার কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি।

* ষষ্ঠ বেতন কমিশনের আর্জি অনুসারে দ্রুত বেতন বৃদ্ধি ।

* সংখ্যালঘু বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা এবং বৃত্তির পরিমাণ বৃদ্ধি ।

* মাদ্রাসাসহ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য কল্পতরু।

অন্ধ্রপ্রদেশ ঃ

কংগ্রেস সরকারের দেওয়া প্রতিশ্রুতি ---

* কৃষকদের বিনামূল্যে কৃষিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ।

* হেলথ্ ইনসিউরেন্স।

* তপশিলি জাতি, তপশিলি উপজাতি আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া ছাত্র-ছাত্রী, সংখ্যালঘু ও অনগ্রসর ছাত্র-ছাত্রীদের আর্থিক সহযোগিতা।

* তপশিলি জাতি, তপশিলি উপজাতি, প্রতিদ্বন্দ্বী, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও মহিলাদের ১ লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণদানের প্রতিশ্রুতি।

* গৃহ নির্মাণের জন্য আর্থিক ঋণের পরিমাণ ইতিমধ্যেই কংগ্রেস আগের থেকে বাড়িয়ে দিয়েছে। শহরতলির মানুষও এই সুবিধা পাচ্ছে।

* ভোটের মুখে কো-অপারেটিভ সোসাইটিও ঋণদানের বিষয়ে কল্পতরু।

* ২ টাকার বিনিময়ে চাল বিতরণ।

ওড়িশা ঃ

নবীন পট্টনায়েকের বিজেডি সরকারের প্রতিশ্রুতি ---

* রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের জন্য ষষ্ঠ বেতন কমিশনের আর্জি পূরণ।

* রাজ্যে ৪,৭০০ শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মী নিয়োগ করা হবে।

* আইনজ্ঞ ও বিচারপতিদের জন্য রিটেনার ফি বাড়িয়ে দ্বিগুণ করা হয়েছে।

তামিলনাড়ু ঃ

তামিলনাড়ুর ডি এম কে সরকারের দেওয়া প্রতিশ্রুতি ---

* গরীবদের জন্য ১ লাখ টাকা পর্যন্ত ফ্রি হেলথ্ ইনসিউরেন্স।

* কলেজে ষাট হাজার কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি---

* মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক কর্মীদের ২ শতাংশ বেতন বৃদ্ধি করা হয়েছে।

উত্তরপ্রদেশে ঃ

মায়াবতী সরকারের ভোটের উপহার ---

* কৃষিজ বীজসহ বিভিন্ন তেলের ওপর থেকে ভ্যাট প্রত্যাহার করা হয়েছে।

* শহরে নতুন বাস সার্ভিস চালু হয়েছে।

* গরীব মুসলিম মহিলাদের মধ্যে ১ কোটি থেকে ১২ কোটি টাকার আর্থিক অনুদান বৃদ্ধি ।

আক্রান্ত আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ

উত্তম কুমার মাহাত, পোর্ট ব্লেয়ার।। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী, গান্ধার হতে ব্রহ্মদেশ, এই তো মোদের ধ্যানের ভারত, এই তো মোদের পুণ্য দেশ। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী, কেন ক্যাম্বেল বে নয়, দক্ষিণে ভারতবর্ষের মানচিত্রে দেখুন কন্যাকুমারী থেকেও নীচে ক্যাম্বেল বে। ভারতবর্ষের মানচিত্রে আবছা করে দেখানো হচ্ছে আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জকে। যেখানে ৬৭২টি দ্বীপ আছে, এবং সেখানে মানুষ বসবাস করে মাত্র ৩৪টি দ্বীপে গত কয়েক বছর ধরে। বিশেষ করে সুনামির পর সমস্ত রকম আক্রমণ চলছে। প্রথমে উল্লেখ করতেই হয়, হিন্দুস্থানকে মুসলিমস্থান বানানোর জন্য পরিকল্পনা মাফিক বাংলাদেশ থেকে হাজারে হাজারে মুসলিম পশ্চিমবঙ্গ হয়ে পোর্টব্লেয়ার পৌঁছচ্ছে এবং ডিগলিপুর থেকে ক্যাম্বেল বে পর্যন্ত ৩৪টি দ্বীপে তারা ছড়িয়ে পড়ছে। কিছুদিনের মধ্যেই এই ছোট্ট ছোট্ট দ্বীপগুলি তারা কব্জা করে ফেলার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এরমধ্যে দ্বীপ সমূহতে যত জনসংখ্যা থাকার কথা তার তিনগুণ হয়ে গেছে। আমরা হিন্দুরা 'হাম দো, হামারে এক' —এতেই আঁটকে আছি। পোর্টব্লেয়ারে রাস্তার দু-পাশে যত ফুচকাওয়ালা আছে, তারা সকলে অনুপ্রবেশকারী মুসলমান। এছাড়াও পোর্টব্লেয়ার শহরের অধিকাংশ বাড়িতে পরিচারিকার কাজেও মুসলিম মহিলাদের আধিপত্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ফলে বাড়িতে চুরি-ডাকাতির ঘটনাও ঘটতে শুরু করেছে, যেটা আগে ছিল না।

সুনামির পর জনসেবার নাম করে এখানে খৃস্টান মিশনারীরা এন জি ও-র মাধ্যমে নিজেদের কার্যসিদ্ধি করে চলেছে। সেবা ভারতী গত দুই বছর ধরে ওয়ান টিচার স্কুল যেটা বালক বালিকাদের সংস্কার দেওয়ার কাজ করছে, সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় পরম্পরা ও হিন্দু সংস্কৃতির পরিবেশ নির্মাণ করে চলেছে। বাটার ফ্লাই নামে একটি এন জি ও সেবা ভারতীর কাজের ভয়ে ভীত হয়ে স্কুল খুলে ফেলেছে। এইভাবে দেশপ্রেমী সংগঠনগুলোর কাজে বাধা দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে।

পর্যটন বিকাশের নামে যে ভাবে পাশ্চাত্য কালচারের প্রসার ঘটানো হচ্ছে, তাতে আগামী প্রজন্মকে শেষ করে দেবার জন্য যথেষ্ট। হ্যাভলক ও নীল দ্বীপ তার উদাহরণ। সারা পৃথিবীর ভ্রমণ পিপাসুদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু এই দ্বীপপুঞ্জ। তাই প্রতিটি বাড়ির রান্নাঘরে খাওয়ার জন্য বিদেশীদের যাতায়াত বেড়েছে। ফলে রান্নাঘরগুলো এক একটি বার-এ পরিণত হয়েছে। হয়ে উঠছে বিভিন্ন ড্রাগের নেশার আখড়া এবং এর ফলে সামাজিক ও পারিবারিক জীবন ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে। বর্তমান যুব সমাজ পাশ্চাত্যের অনুসরণ করতে গিয়ে হিন্দু সমাজ-জীবন, সংস্কৃতি সবই পিছনে ফেলে দিচ্ছে। এভাবে বেশিদিন চললে এতদ্‌অঞ্চলে হিন্দু সংস্কৃতি, পরম্পরা বেঁচে থাকা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেবে।

কৃষির প্রতি উপেক্ষার বিরুদ্ধে এ এক কৃষক বিদ্রোহ

সি পি এম নেতা প্রহৃত মেদিনীপুরে

এন সি দে ।। পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কেশপুর গ্রামের রামপাড়ায় গত ৭ মার্চ আন্দোলনরত ক্রুদ্ধ কৃষকরা পঞ্চায়েত প্রধানসহ কয়েকজন সিপিএম নেতাকে বেধড়ক পিটিয়ে বন্দী করে রাখে। নিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহের দাবিতে সেদিন কৃষকরা আনন্দপুর-কেশপুর রোড অবরোধ করে রেখেছিল। কৃষকদের অবরোধ ওঠাতে গিয়েছিল আনন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান দেবাশীষ রায়, সিপিএম-এর আনন্দপুর লোকাল কমিটি সেক্রেটারি গোরাচাঁদ ভুঁইঞা এবং লোকাল কমিটি মেম্বার কালিপদ মান্না। কৃষকেরা এই তিনজনকে ঘরে তালা বন্ধ করে রাখে। এন্তাজ আলি নামে আর এক সি. পি. এম নেতা অবস্থা খারাপ বুঝতে পেরে সুযোগ বুঝে কেটে পড়ে। এক ঘণ্টা পর আনন্দপুর ও কেশপুর থেকে পুলিশ ফোর্স আসে নিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দিয়ে অবরোধ তোলা হয়।

বিদ্যুতের অভাবে সেচের কাজে বসানো গভীর নলকূপগুলো অকেজো হয়ে থাকায় বোরো চাষ মার খাচ্ছে। ফলে এলাকার চাষীরা বেশ কিছুদিন নানাভাবে ক্ষোভ প্রকাশ করছিল পঞ্চায়েতে ও বিদ্যুৎ পর্ষদের ওপর। কিছুদিন আগে কেশপুর বাজারের এলুনিতে রাস্তা অবরোধ করেছিল চাষীরা। গত ১১ জানুয়ারি পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোণা অঞ্চলের কৃষ্ণপুর গ্রামের লোকেরা সিপিএমের বিধায়ককে বন্দী করে রেখেছিল। তবুও সিপিএম সরকার পশ্চিমবঙ্গের কৃষি ও কৃষকের উন্নয়ণের দিকে কোনও নজর দিচ্ছে না। তাদের মাথায় ঢুকেছে শিল্পের পোকা। তাদের কৃষক সংগঠন কৃষক সভা স্পষ্টই ঘোষণা করেছে যে 'তারা আর কৃষকদের কৃষি সম্পর্কিত কোনও দাবিদাওয়া এবং জমির অধিকার আদায়ের লড়াই করবে না।' অতএব তাদের উদ্দেশ্যই হল কৃষি ও কৃষকদের ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া। তাই বিশাল কেশপুর এলাকার জন্য মাত্র একটি ৩৩ কেভি সাব-স্টেশন বসিয়েছে এবং সেটাও অনেক বছর আগে দোগাছিয়া এলাকায়। যা এই বিশাল এলাকার পক্ষে মোটেই যথেষ্ট নয়।

কৃষিকে ধ্বংস করার এই ষড়যন্ত্র সারা দেশেই চলছে। কংগ্রেস এই কাজে বিশ্বস্তভাবেই পেয়েছে বামপন্থীদের। ইস্টার্ন রিজিওনাল পাওয়ার কমিটির মেম্বার সেক্রেটারি শ্রী আর কে. গ্রোভারের দেওয়া তথ্য থেকেই তা পরিষ্কার। এই কমিটি ভারত সরকারের বিদ্যুৎ মন্ত্রকের অধীনস্থ সেন্ট্রাল ইলেকট্রিসিটি অথরিটির অধীন। শ্রীগ্রোভার সম্প্রতি জানিয়েছেন যে, পশ্চিমবঙ্গসহ গোটা পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে বিদ্যুতের চাহিদা না থাকায় এই রাজ্যগুলি অন্যান্য অঞ্চলে বিদ্যুৎ বিক্রি করছে। তার দেওয়া তথ্যে দেখা যাচ্ছে, যে পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ, পশ্চিমাঞ্চলের গুজরাট রাজ্যের মাথা পিছু চাহিদার তুলনায় ৩০ শতাংশেরও নীচে রয়েছে। গুজরাটে চাহিদা যেখানে ১২৫০ ইউনিট, পশ্চিমবঙ্গের চাহিদা সেখানে মাত্র ৩৬০ ইউনিট। এটা লজ্জাজনকই শুধু নয়, কৃষির পক্ষেও ভয়াবহ। এ তথ্য এমনকী বামপন্থী দলগুলির অধীন কৃষকদের কাছে পৌঁছলেও তারা বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে অবশ্যই বিদ্রোহ ঘোষণা করবে। কারণ তারা যেখানে বিদ্যুতের অভাবে চাষবাসের কাজে সেচের জল পাচ্ছে না, সেখানে সরকার বিদ্যুৎ অন্য রাজ্য বিক্রি করে রোজগার করছে।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা দরকার যে, ঝাড়খণ্ডের মতো ছোট্ট রাজ্যেও চাহিদা রয়েছে মাথা পিছু ৪০০ ইউনিট অর্থাৎ আমাদের থেকেও বেশি। ওড়িশাতে আমাদের থেকে অনেকটাই এগিয়ে রয়েছে। ওদের চাহিদাও ৬৩০ ইউনিট।

একদিকে হাজার-হাজার শিল্প-কারখানা বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে, অন্য দিকে শিল্পের নামে কৃষি জমির ওপর দখল নেওয়ার জন্য নয়া কমিউনিস্ট-বর্গীদের আক্রমণে এবং সরকারি উপেক্ষায় রাজ্যের কৃষি ঝুঁকছে। শিল্পও নেই কৃষিও নেই, বিদ্যুতের চাহিদা নেই। প্রমোটারদের হাতে জমি বিক্রি করা আর অন্য রাজ্যকে বিদ্যুৎ বিক্রি করার কাজেই নেমেছে এককালের কৃষি বিপ্লবীরা। কৃষি বিপ্লবের ঢাক পিটিয়েই কমিউনিস্টরা পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতা দখল করেছে। এখনও পুরোনো বাড়ির দেওয়াল খুঁজলে দেখা যাবে তাতে লেখা আছে "কৃষি-বিপ্লবই মুক্তির একমাত্র পথ।" সেই কমিউনিস্টরা আজ শুধু কৃষিকে উপেক্ষাই করছে না, কৃষিকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রও করছে।

স্বদেশি জাগরণ মঞ্চ (পশ্চিমবঙ্গ)-র তরফ থেকে পশ্চিমবঙ্গের বাম সরকারের তীব্র নিন্দা করে এক বিবৃতিতে কৃষকদের আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানানো হয়েছে। স্বদেশি জাগরণ মঞ্চ আরও জানিয়েছে যে, আজকের কৃষির এই ক্রমাবনতির সম্ভাবনার কথা মঞ্চ ১৯৯৩ সালেই কৃষকদের জানিয়ে রেখেছিল--"ডাঙ্কেল প্রস্তাব ঃ কৃষকদের সর্বনাশ" পুস্তিকার মাধ্যমে। আজ কৃষি খাদের কিনারে এসে দাঁড়িয়েছে। খোদ 'অর্জুন সেনগুপ্ত কমিটি' তার রিপোর্টে জানিয়েছে যে, ২০০৫ সালেই দেশের ৭৮ শতাংশ গ্রাম্য জনগণ প্রত্যহ মাত্র ২০ টাকায় দিন গুজরান করত। রাষ্ট্রসংঘের ওয়ার্ল্ড ফুড-প্রোগ্রাম জানিয়েছে যে, দুনিয়ার ক্ষুধার্ত মানুষের অর্ধেকই বাস করে এই ভারতে। আগামী নির্বাচনে কৃষকদের বেছে নেওয়া উচিত সেই দলকে যে স্বদেশি কৃষি ও শিল্পকে রক্ষা করবে।

মালদায় আফিম চাষের পেছনে বড় চক্র রয়েছে

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ মালদা।। মালদা জেলার বেশ কিছু জমিতে বেআইনিভাবে আফিম চাষ হচ্ছে বেশ কয়েকবছর ধরেই। পুলিশের চোখ এড়িয়ে এই আফিম চাষ এখন লাভজনক ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। বিশেষত মুসলিম অধ্যুষিত কালিয়াচক ১ এবং ২নং ব্লকের বিভিন্ন গ্রামগুলিতে আফিম চাষ চলছে। গত ৪ মার্চ কালিয়াচক ২ নং ব্লকের মোথাবাড়ি মেহেরাপুর গ্রামের ভাদু শেখের ১০-১৫ বিঘা জমিতে বেআইনি আফিম গাছ পুলিশ নষ্ট করে দেয়। গ্রেপ্তারের ভয়ে ভাদু শেখ ও এরশাদ আলি গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছে। আফিম গাছ বিক্রি করে এরা রাতারাতি লাখপতি হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিল। স্থানীয় মানুষের অভিযোগ, গোটা মালদা জেলা জুড়ে একটি বড় চক্র বেশ কিছু গরীব চাষীকে লোভ দেখিয়ে আফিম চাষ করাচ্ছে। এর আগে এই এলাকার বাবলা ও অচিনতলা থেকে ৫ বিঘা আফিম গাছ পুলিশ নষ্ট করে দিয়েছে। অপরাধমূলক কাজের সঙ্গে সংখ্যালঘু মুসলিমরা ক্রমশ বিভিন্ন দিক দিয়ে জড়িয়ে পড়ছে। কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলি সেদিকে লক্ষ্য রাখে না।

ভোটরঙ্গে রসাতলে পশ্চিমবঙ্গ

শ্যামাপ্রসাদ দাস

লোকসভা নির্বাচনের আর বেশি দেরি নেই। এরই মধ্যে শুরু হয়ে গেছে পশ্চিমবঙ্গকে রসাতলে ডুবিয়ে সিপিএম সরকারের ভোটরঙ্গ। মনে হচ্ছে, তারা হয়তো একটা স্থির বিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে চলছে, এবারের নির্বাচন ঘিরেই শুরু হয়ে যাবে তাদের বিদায় লগ্ন। অতএব পরবর্তীকালে যে দল সরকার গঠন করতে আসবে, তারা যেন ডুবে থাকে একগলা ঋণের জলে। এবার দেখা যাক, কীভাবে ভোটরঙ্গে সি পি এম সরকার পশ্চিমবঙ্গকে রসাতলে ডুবিয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে বিশেষভাবে বুদ্ধদেববাবুর মন্ত্রী সভার একটাই মনোভাব, এ দেশে আমরা ছাড়া আছে কে? অতএব দেশের প্রচলিত আইনকানুন চুলোয় যাক, আমরা যা খুশী তাই করব। এটাই আইন, এটাই নিয়ম। মনে করুন, এবার কেন্দ্রীয় সরকারের জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্পের কথা। সেখানে তারা ১৪০ কোটি টাকা অন্য খাতে ব্যয় করে ব্যর্থতার আগুন ছাই চাপা দিয়ে রেখেছে। বিশেষ করে পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় ৭০ কোটি টাকা অন্যখাতে ব্যয় করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। অন্যদিকে ২০০৫-০৬ আর্থিক বছরের দ্বাদশ অর্থ কমিশনের এক খাতের টাকা অন্য খাতে ব্যয় করা হয়েছে। তার পরিমাণ ১০২ কোটি ২ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা। বাজেট বরাদ্দ ছাড়াই রাজ্যের ৫১টি গ্রাম পঞ্চায়েতে ১৪ কোটি ৯৫ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা ব্যয় করেছে। বাজেট বরাদ্দের অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় হয়েছে রাজ্যের ১৫৫৯টি গ্রাম পঞ্চায়েত, যার খরচের সঙ্গে কাজের কোনও সঙ্গতি নেই। নিয়ম বহির্ভূত ওইসব খরচের পরিমাণ ৭৭ কোটি ৯৩ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা। ২৬টি পঞ্চায়েত সমিতি ওই আর্থিক বছরে ১২ কোটি ৮ লক্ষ ১১ হাজার টাকা ব্যয় করেছে। ৬টি জেলা পরিষদ রাজস্ব বরাদ্দের অতিরিক্ত ১৯ কোটি ৪ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা ব্যয় করেছে। অন্যদিকে, ১৮টি জেলা পরিষদের অধীন ৩ হাজার ১৭৩টি গ্রাম পঞ্চায়েত ৫৮ কোটি ১ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা রাজস্ব আদায় করেনি, শুধুই দানছত্রের বাহানা দেখিয়েছে ভোট ব্যাঙ্ক গঠন করার জন্য। কারণ ওইসব কর্মচারীদের অধিকাংশই সিপিএম কর্মী বলে অভিযোগ শোনা যাচ্ছে।

বিরোধী পক্ষের যে যাই বলুক না কেন, নানা অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে রাজ্য সরকারের নিজের এগজামিনার অব লোকাল অ্যাকাউন্টসের ২০০৬-০৭ সালের অডিট রিপোর্টে। শুধু কী তাই, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিকাঠামোটি ৩২ বছরে একটি পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক আখড়ায় রূপান্তরিত হয়ে এখন তা ক্রমশই বেওয়ারিশ সম্পত্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। তার একটি ছোট উদাহরণ হল— পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা-২ পঞ্চায়েত সমিতি। কোনওরকম বাজেট তৈরি না করেই ২০০৪-০৬ দুটি আর্থিক বছরে সম্পূর্ণ অবৈধভাবে ৫ কোটি ৮ লক্ষ টাকা ব্যয় করেছে সমিতি।

সম্পূর্ণ গ্রামীণ রোজগার যোজনা কর্মসূচীতে মহিলাদের ন্যূনতম ৩০ শতাংশ নিযুক্তির শর্ত বাধ্যতামূলক হলেও ২০০৫-০৬ আর্থিক বছরে ১৩টি পঞ্চায়েত সমিতি ওই যোজনা কর্মসূচীর

নির্দেশিকা অমান্য করে ঠিকাদার নিযুক্ত করে নিয়ম বিরুদ্ধ ভাবে ১ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা খরচ করেছে।

সিপিএম সরকারের দেউলিয়া রাজনীতির আর একটি নমুনা হল— আত্মপ্রচারে লক্ষ-লক্ষ টাকা ব্যয় করে বাহারি বিজ্ঞাপন। এই বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে কীভাবে যে তারা সাম্প্রদায়িক ভেদ-ভাবনা সৃষ্টি করছে, সেই বোধশক্তিও তাদের নেই। সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় মুসলমান নারী-পুরুষের ছবি দিয়ে বিজ্ঞাপন, 'বন্টিত জমির প্রায় ২৫ ভাগ পেয়েছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়।

শুধু মাদ্রাসার উন্নতিতেই এই রাজ্যে বরাদ্দ হয়েছে ৩৬৬ কোটি টাকা।' সংখ্যালঘু মহিলা ক্ষমতায়ণ প্রকল্পে সংখ্যালঘু মহিলাদের স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে বরাদ্দ হয়েছে অতিরিক্ত ২০ কোটি টাকা।" এমনি আরও অনেক কিছু বর্ণনার পরে বামফ্রন্ট সরকারের ৩১ বছর পূর্ণের সংলাপে কিন্তু অন্য সম্প্রদায়ের মানুষের উন্নতির কর্মসূচী আলাদা করে কোনও বিজ্ঞাপনে দেখা যায় না। এমনকী গঙ্গাসাগর মেলায় যে তীর্থকর আদায় করা হয় প্রতি বৎসর, সেই টাকায় তীর্থযাত্রীদের জন্য বা ক্যাডার প্রকল্পের কোনও উন্নতি করা হয়েছে কিনা, তারও বিজ্ঞাপন নেই।

যাই হোক, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের খাতায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ঋণের বোঝা আকাশ ছোঁয়া হলেও ঋণ করে যে ঘি খেতে হয়, এই প্রবাদ বাক্যটি পশ্চিমবঙ্গ সরকার অক্ষরে-অক্ষরে পালন করে চলছে। এর প্রমাণ হল ভোটের মাসে মোটা বেতন রাজ্যের সরকারি এবং আধা-সরকারি কর্মচারীদের। কারণ, ভোটগ্রহণ, ভোটের বাক্স পাহারা, ভোট গণনা এবং ভোটের ফল প্রকাশ করবেন তো তারাই। এই দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্তের সীমাহীন দেউলিয়া প্রকল্প যা এখন বিশ্বরেকর্ড করেছে। একটি পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়, যাদের ন্যূনতম পেনশন/ফেমিলি পেনশন ১৩০০ টাকা, তা বেড়ে হয়েছে ৩৩০০ টাকা। আর অন্যান্য পেনশন ও ফেমিলি পেনশনের উর্ধসীমা ১১ হাজার ২০০ টাকা এবং ৬৭২১ টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে যথাক্রমে ৩৫ হাজার এবং ২১ হাজার টাকা। এর ফলে ব্যবসায়ীগণও সমানতালে তাল মিলিয়ে তাদের উপার্জন বৃদ্ধি করতেও হয়তো পিছপা হবেন না। যাই হোক, এবার আর পেনশনভোগীদের কোনও টেনশন রইল না। অন্যান্য সরকারি কর্মচারীদেরও বেতন বৃদ্ধি হবে গড়ে ৩২ শতাংশ। মহার্ঘ ভাতা ৪ শতাংশ। এমনি নানারকম হিসেব নিকেশ। এইসব টাকা দেবে কোন গৌরী সেন? প্রশ্ন এখানেই— রাজস্ব বৃদ্ধি না হলে রাজকর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির টাকা আসবে কোথা থেকে? সেদিকে হাত বাড়ালেও যে আবার নির্বাচনে কাত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কাজেই সমস্যা সমাধানের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চিরাচরিত প্রথা প্রচার--প্রাচুর্য, উন্নয়ণের। কাজকর্ম, তা চিরাচরিত একই বাকচাতুরি। মহামান্য সরকার সরকারি কর্মচারীদের যদি কথা দিয়ে কথা রাখতে না পারে, সেক্ষেত্রেও আত্মরক্ষার একটিই উপায় সেই বাকচাতুরী--"কেন্দ্রে দিচ্ছে না আমরা করব কি।" যদি এবার আসন্ন লোকসভা-বিধানসভা নির্বাচনে তাদের ফল ভালো না হয়, তা হলে তো দেউলিয়া সরকার সামলাতে হিমসিম খাবে নবগঠিত মন্ত্রীসভা।

এর সঙ্গে প্রতিবাদী সিপিএমের মিছিল-মিটিং--'আমাদের দাবি মানতে হবে, নইলে গদি ছাড়তে হবে।' অতএব পশ্চিমবঙ্গে যে কোনও নবগঠিত সরকারের মাথায় বহুদিন থাকবে বামপন্থী শাঁখের করাত।

বিষাক্ত কালনাগ আই এস আই

কিরণ শঙ্কর মৈত্র

আই এস আইয়ের সঙ্গে সিমি-র যোগাযোগ ক্রমাগত ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে, কারণ তাঁদের উদ্দেশ্য একই ঃ ভারতের সর্বনাশ সাধন। ২০০৫-এর ২১ জুলাই মুম্বাইয়ের সাতটি লোকাল ট্রেনে এবং শ্রীনগরের পাঁচটি জায়গায় একই সঙ্গে সাংঘাতিক বিস্ফোরণের ঘটনায় এই দু'য়ের মারাত্মক ধ্বংসাত্মক কার্যক্রমের পরিচয়। ISI-কে SIMI-র নেটওয়ার্কের সাহায্যের বিষয়ে কেন্দ্র সরকার ১লা জুলাই (২০০৬) গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, কেরল, অন্ধ্রপ্রদেশ ও অসম--ছটি রাজ্যকে সতর্ক করে দেয়--নাগপুর ঘটনার প্রপ্রেক্ষিতে।

পুলিশ সন্দেহ করে যে, তিনজন টেররিস্ট নাগপুরে RSS হেডকোয়ার্টার আক্রমণ করতে এসেছিল, তারা সিমি নেটওয়ার্ককে ব্যবহার করেছিল এই কাজের জন্য— অস্ত্রশস্ত্র জোগাড় করতে। বম্বে পুলিশের কাছ থেকে সতর্কবাণী পেয়ে নাগপুর পুলিশ তৈরি ছিল। ১ জুন খুব ভোরে সন্ত্রাসীরা এসেছিল একটি অ্যাম্ব্যাসাডারে, উপরে জ্বলন্ত লাল বাতি, তাদের পোশাক ছিল সাব-ইন্‌স্‌পেক্টরের। অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে ছিল তিনটি AK 56, অ্যাসল্ট রাইফেল, এক ডজন হ্যান্ড গ্রেনেড, প্রচুর পরিমাণে RDX। RSS-এর কার্যকর্তারা ছাড়াও

তখন সেখানে এসেছেন দেশের নানা জায়গা থেকে এক সহস্রাধিক স্বয়ংসেবক। পুলিশ সন্ত্রাসীদের বিনাশ না করলে তারা ত্মত্রত্র হেডকোয়ার্টারসহ সব নেতা ও অনুগামীদের নিশ্চিহ্ন করে দিত।

হোম মিনিস্ট্রি সূত্র থেকে জানা যায় যে, ঔরঙ্গাবাদ ও মালেগাঁও থেকে পাওয়া ৪৩ কেজি RDX এবং ১৬টি AK সিরিজের রাইফেল এবং পরে ধৃত SIMI-কর্মীকে জিজ্ঞাসাবাদের পরে তাদের লুকিয়ে থাকবার জায়গাগুলির ধরন সম্বন্ধে বোঝা যায়। ATS (অ্যান্টি টেররিস্ট স্কোয়াড) জানতে পারে সিমির ভূতপূর্ব মেম্বার মইনুদ্দিন আনসারি সম্বন্ধে, যে ছিল লস্কর-এ-তৈবার মুখ্য সদস্য।

১৬ মার্চ কানপুর দাঙ্গার পরিকল্পনা করেছিল যে ব্যক্তি, যার বিরুদ্ধে গুরুতর রাজদ্রোহের অভিযোগ, সেই ব্যক্তিকে যদি সমাজবাদী পার্টির একজন বিখ্যাত রাজনৈতিক নেতা VIP-র সমাদরে লাক্সারি কারে, পুলিশ স্টেশনে মহাসমাদরে রাত্রিবাসের ভোগবিলাস আরাম শয্যা উপভোগের পরে, পরের দিন একজন মেট্রো-পলিটান ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে নিয়ে যাওয়া হয় 'আত্মসমর্পণ-এর জন্যে, সেটা কি বিস্ময়ের ব্যাপার হবে? না, অন্তত উত্তরপ্রদেশে নয়।

উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের সিমি প্রেসিডেন্ট মোহম্মদ আমির এই সৌভাগ্যবান ব্যক্তি। যখন সাংবাদিকরা কোর্ট ক্যাম্পাসে তার 'বিখ্যাত সারেন্ডারের' কথা জানতে চাইলেন, তখন এই সংবাদ বাইরে প্রকাশ পাওয়ায় সে একটু বিস্ময় প্রকাশ করল। কিন্তু জানাতে ভুলল না যে, ১৬ মার্চের আরেক অভিযুক্ত ডঃ আব্রার আহমেদের সৌজন্যেই এটা সম্ভব হয়েছে এবং বিজেপি নেতা আদবানী এবং রাজনাথ সিং তার বিরুদ্ধে অভিযোগের জন্যে দায়ী। সিমি ক্যাডাররা যেভাবে ওসামা বিন লাদেনকে 'হিরো' বানিয়ে অতি উচ্চে স্থান দেয়, আমিরও কি লাদেনকে তেমন মনে করে?--সাংবাদিকের এই প্রশ্নের উত্তরে সে বলে, "লাদেন টেররিস্ট নয়। সে আমেরিকার শত্রু, ভারতের নয়। সে মানুষের খুব উপকার করছে— আমেরিকার বিরুদ্ধে গিয়ে।" সিমির প্রতি তার আনুগত্যের কথা দ্বিধাহীনভাবে ব্যক্ত করে--"সিমির জন্যেই আমি আমার ধর্মকে ভালোভাবে বুঝতে পেরেছি। সিমি আমার জীবন বদলে দিয়েছে।"

বাংলাদেশের টেরর স্যাংচুয়ারিতে বিগত বছর যে-কাটিয়েছে সে এখন কানপুরের জেলের ছ'নম্বর ব্যারাকে। কিন্তু কতদিন?

তার পক্ষে উত্তরপ্রদেশের তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থা ছিল খুবই অনুকূল। যে-ভাবে সিমির জেলা প্রেসিডেন্ট সলমন আহমেদ এবং হিজবুল মুজাহিদিন সন্ত্রাসবাদী মোহম্মদ জাহির, তারা দু'জনেই কানপুরের ১৬ মার্চ দাঙ্গায় উস্কানি দেওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত, জামিনে মুক্তি পেয়ে নিখোঁজ হয়ে গেছে, সেও সেইভাবে মুক্তি পাওয়ার আশায় নিশ্চিত। রাজনৈতিক অবস্থা সম্পূর্ণ অনুকূলে। সিমির ওপরে নিষেধাজ্ঞা বাড়াবার জন্যে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তাবে উত্তরপ্রদেশ সরকার সরাসরি অসম্মতি জানিয়েছে। ফলে দেশের সুরক্ষা বিপজ্জনক স্তরে পৌঁছে গেছে। পুলিশের গোপন সূত্রানুযায়ী "সিমি নতুন নামে নিজেদের সুসংগঠিত করছে। তারা সংখ্যালঘুদের বিরাগভাজন হতে চায় না। এটাই একমাত্র কারণ--সিমির বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা না নেওয়ার, এদের নেতাদের গ্রেপ্তারের তো কোনও প্রশ্নই ওঠে না।" লোকেদের দেখাবার জন্যে ওপরে-ওপরে কিছু করা হয়। কিন্তু তা শুধু 'পেপার ওয়ার্ক', তার বেশি কিছু নয়। সিমি কর্মীরা বিশেষভাবে সক্রিয় আজমগড়, মউ, সন্ত - রবিদাসনগর, শাজাহানপুর, মোরাদাবাদ, রামপুর, ভডোহি, সিদ্ধার্থনগর, গোণ্ডা, শ্রাবন্তী, ফৈজাবাদ ও লক্ষ্ণৌতে।

এ ব্যাপারে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য সত্যটি হল— সুপ্রীম কোর্ট সিমির উপরে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে রাজী হয়নি।

পাকিস্তানের ঢত্রঢ এবং অন্যান্য ভারত বিরোধী সন্ত্রাসবাদীরা এবং মুম্বাইস্থিত লস্কর-এ-তৈবা প্রমুখ দলগুলি যে মুম্বাইয়ে কোনও ভয়ঙ্কর বিধবংসী ধ্বংসকাণ্ড ঘটাতে চাইছে, তার আভাস ভারতের নিরাপত্তা বিভাগ আগেই পেয়েছিল।

আই এস আইয়ের সঙ্গে ভারতবিরোধী কর্মে, বিশেষ করে সিমির সে এমন ঘনিষ্ঠ সহযোগী যে ৭ জুলাই মুম্বাইয়ের সাতটি ট্রেনে বিস্ফোরণে সিমির ভূমিকা অত্যন্ত স্পষ্ট। অনুসন্ধানের ফলে তাদের পৈচাশিক কাজকর্মের অনেক কথা জানা যায়। তাই বলা যেতে পারে, আই এস আই যদি বিষাক্ত কালনাগ, তবে কালকূট কালকেউটে হল সিমি। ।। সমাপ্ত।।

ভারতীয় রাজনীতিতে মহিলারা আজও উপেক্ষিত

নিজস্ব প্রতিনিধি।। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে ভারতবর্ষের মহিলাদেরও পুরুষদের তুলনায় আনুপাতিক হারে প্রতিনিধিত্ব এবং নির্বাচিত হওয়া একান্তভাবে বাঞ্ছনীয়। একথা

অবশ্য ঠিক যে, বিগত ষাট বছরে ভারতবর্ষের রাজনীতিতে মহিলাদের অংশীদারিত্ব ক্রমশ বেড়েছে। বিশেষত পঞ্চায়েতে নির্দিষ্ট সংখ্যক আসনে মহিলা প্রতিনিধি বাধ্যতামূলক হওয়ার পর দেশ

জুড়ে লক্ষ-লক্ষ সংখ্যায় মহিলারা পঞ্চায়েতে নির্বাচিত হয়ে আসছেন। পঞ্চায়েতী আইন চালু হওয়ায় কোটি-কোটি মহিলাদের নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া থেকে সক্রিয় রাজনীতিতে আসতে সুবিধা হয়েছে। এক এক বার এই মহিলাদেরকে দুর্লক্ষ্য করে বলা হোত যে, মহিলাটি নির্বাচিত হলেও তার স্বামীই বকলমে সবকিছু দেখাশোনা করবেন। এখন আর তা বলা হয় না। কারণ মহিলারা স্বাবলম্বী হয়েছেন। অল্প সময়কালের মধ্যেই তারা শিক্ষিতা, অশিক্ষিতা বা অর্ধশিক্ষিতা যাই হোন না কেন দক্ষতা দেখিয়েছেন, পঞ্চায়েত পরিচালনায়, বিভিন্ন উন্নয়ণ প্রকল্প রূপায়ণে। বিগত দু'দশকে দেশকে সুসংহত ও শক্তিশালী করার কাজে তারাও হাত লাগিয়েছেন।

ইন্দিরা গান্ধীর হত্যাকাণ্ডের পর এবং রাজীবের প্রধানমন্ত্রীত্বের সময়ে উত্তরপ্রদেশের রামজন্মভূমি আন্দোলনে মহিলাদের অংশগ্রহণ ব্যাপক সংখ্যায় ছিল। তবে ভাবাবেগ মহিলাদের রামজন্মভূমি আন্দোলনে সক্রিয়তায় প্রবৃত্ত করলেও স্থায়ী হয়নি। ১৯৯৩ সালে সংবিধান সংশোধন করে স্থানীয় পঞ্চায়েত, পুরসভা ও নগরনিগম নির্বাচনে মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষিত করা হয়। তখন থেকে সাধারণভাবে কম দুর্বল, গরীব ও পশ্চাৎপদ শ্রেণীর মহিলারা ধীরে-ধীরে রাজনীতি---নির্বাচনে লড়াই করার কলা-কৌশল বিষয়ে অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণ লাভ করেন। তবে এর মানে এই নয় যে, তারা গণতন্ত্রের অবধারণা, ভোটদান প্রক্রিয়ার গুরুত্ব বা জনগণের সার্বিক ভূমিকা বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে অভিজ্ঞ হয়ে গেছেন।

তবে সুযোগ পেলে মহিলারাও পুরুষদেরকে রাজনীতিতে সঠিক মার্গদর্শন করতে পারেন, সমাজের ও রাষ্ট্রের উন্নতিতে পথ দেখাতে পারেন। প্রয়োজন রয়েছে সমস্যা বিষয়ে সংবেদনশীলতার। দেশে ৮ লক্ষের বেশি মহিলাদের সেল্ফ হেল্প গ্রুপ (স্বয়ং সহায়ক দল) রয়েছে। তার ফলও দেখা যাচ্ছে। এদের মাধ্যমে মহিলাদের সঞ্চয় করার বিষয়ে সুষ্ঠু অবধারণা ও মনোভাব বিকশিত হচ্ছে। তারা নিজেরা অর্থ উপার্জনের সঙ্গে সঙ্গে অন্যকেও উপার্জনে প্রেরণা দিচ্ছেন। মধ্যবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত পরিবারে সবাই মিলে মিশে কাজ করেন। আমাদের দেশে মহিলারা বা স্ত্রীরা পরিবার তথা সমাজের অভিন্ন অঙ্গ। দারিদ্র্য,

সারণি -১

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মহিলা সাংসদদের সংখ্যা এবং অনুপাত

দেশ	মোট সাংসদ	মহিলা সাংসদ	অনুপাত
স্পেন	৩৫০	১২৭	৩৬.৩%
নিউজিল্যান্ড	১২২	৪১	৩৩.৬%
নেপাল	৬০১	১৯৭	৩২.১%
অস্ট্রিয়া	১৮৩	৫০	২৭.৩%
পাকিস্তান	৩৪২	৭৬	২২.২%
চীন	২৯৪৭	৬৩৭	২১.৩%
আমেরিকা	৪৩৫	৭৪	১৭.০%
ইতালি	৬৩০	১৩৪	২১.৩%
কোরিয়া	২৯৯	৪১	১৩.৭%
মালয়েশিয়া	২২২	২৪	১০.৮%
কানাডা	৩০৮	৬৮	২৩.১%
কিউবা	৬১৪	২৬৫	৪৩.২%
বেলারুশ	১১০	৩৫	৩১.৮%
সার্বিয়া	২৫০	৫৪	২১.৬%

সূত্রঃ ইন্টার পার্লামেন্টারি ইউনিয়ন

বেকারত্ব, নিরক্ষরতা, শোষণ, অন্যায়-অবিচার প্রভৃতি সমস্যা উভয়ত।

স্ত্রী-সমাজের উন্নয়ণ, শক্তিশালী করণ, সর্বত্র সমানভাবে অংশগ্রহণ জরুরি। স্বল্প সংখ্যক বিত্তবান মহিলারা তো নিজেদের ঘর-সম্পদ সামলাতেই সদা ব্যস্ত। সেজন্য মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত মহিলাদের এগিয়ে আসতে হবে দারিদ্র্য দূর করতে। পরিবার পরিকল্পনা, পুষ্টিবর্ধক ভোজনের ব্যবস্থা করাতে, নিরক্ষরতা দূরীকরণের সঙ্গে-সঙ্গে কৃষিতেও প্রশিক্ষণ দেওয়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে। তবে সেজন্য লোকসভা ও বিধানসভাতেও ৩৩ শতাংশ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষণ করা আবশ্যক। প্রায় সব রাজনৈতিক দল মুখে সম্মতি দিলেও আইন এখনও পাস হয়নি। ১৯৯৮ থেকে সব দল সংসদের ভিতরে-বাইরে সরব হলেও তা হয়নি। (সারণি ২ দ্রষ্টব্য)

ভারতের সদ্য সমাপ্ত চতুর্দশ লোকসভায় অনেক সুযোগ্য মহিলা সাংসদ থাকলেও মোট সংখ্যার অনুপাতে তা অনেক

কম। মাত্র ৪৮ জন। যদি সংরক্ষণ আবশ্যিক করা হয়, তাহলে ওই সংখ্যাটা ১৭৯ জনে গিয়ে দাঁড়ায়। মাত্র ছয়টি রাজ্যে মহিলা ভোটারদের সংখ্যা পুরুষদের তুলনায় বেশি।

পঞ্চায়েতে ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণ চালু হওয়ার ফলে দেশে পঞ্চায়েত ক্ষেত্রে নির্বাচিত মহিলা জনপ্রতিনিধিদের সংখ্যাটা দশলাখের বেশি। সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক হল রাজনৈতিক দলগুলি প্রার্থী মনোনয়নের সময় মাত্র ১৫ শতাংশ আসনও মহিলাদের দেয় না। এটাই বাস্তব।

২নং সারণী দেখলেই বোঝা যাচ্ছে শতাংশের হিসাবে মহিলাদের ভারতের লোকসভার প্রতিনিধিত্বের শোচনীয় দুরবস্থার চিত্রটা। ইউরোপের উন্নত দেশগুলোর মধ্যে সুইডেনে ৪২ক্ষ , ডেনমার্কে ৩৮ক্ষ এবং নরওয়েতে মহিলাদের সংসদে প্রতিনিধিত্বের হার ৩৬ক্ষ শতাংশ। ১৯৯৯ সালে উগান্ডাতে সাংবিধানিকভাবে মহিলাদের জন্য ১৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণ করা হয়েছে। দেশের ৩৯টি জেলায় ১টি করে আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষণ করা হয়েছে। ৯০-এর দশকে ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে কুড়ি থেকে চল্লিশ শতাংশ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত করা হয়। আর্জেন্টিনা তিরিশ শতাংশ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষণ করে প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। ভারতের প্রতিবেশী দেশ নেপালে প্রত্যেক রাজনৈতিক দল পাঁচ শতাংশ মহিলা প্রতিনিধি সংসদে পাঠাতে একমত হয়। বর্তমানে নেপালের সংসদে ৩৩ শতাংশ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত,আর পাকিস্তানে স্থানীয় প্রশাসনে ২২ শতাংশ সংরক্ষণ রয়েছে মহিলাদের জন্য। বেলজিয়াম, ইতালি এবং তাঞ্জানিয়াতে জাতীয় স্তরে ২০ শতাংশ এবং স্থানীয় স্তরে ২৫ শতাংশ আসন মহিলা প্রতিনিধিদের জন্য সংরক্ষিত করা হয়েছে। ফ্রান্সে ১৯৯৯ সালের আইন আরও কড়া। সেখানে প্রত্যেক রাজনৈতিক দলকে ৫ শতাংশ মহিলা পাঠাতেই হবে। অন্যথায় নগদ জরিমানা। বিগত তিরিশ বছরে মহিলা প্রতিনিধিত্ব বাড়িয়েছে সুইডেন, ডেনমার্ক এবং নরওয়ে। যদিও ওই তিনটি দেশে আলাদা কোনও আইন নেই, কিন্তু বিভিন্ন মহিলা সংস্থা রাজনৈতিক দলের উপরে প্রভাব বিস্তার করেছে। এখানে দু-একটি কথা উল্লেখযোগ্য। ১৯৬০ সাল পর্যন্ত আমেরিকা ও ইল্যান্ডে মহিলাদের ভোটাধিকারই ছিল না। ভারতে প্রতিভা পাতিল প্রথম মহিলা রাষ্ট্রপতি। বৃন্দা কারাত সিপিএম পলিটব্যুরোর প্রথম মহিলা

সারণি - ২

ভারতবর্ষ

সাল	মোট আসন	মহিলা প্রতিনিধিত্ব
১৯৫২	৪৯৯	৪.৪%
১৯৫৭	৫০০	৫.৪%
১৯৬২	৫০৩	৬.৮%
১৯৬৭	৫২৩	৫.৯%
১৯৭২	৫২১	৪.২%
১৯৭৭	৫৪৪	৩.৩%
১৯৮০	৫৪৪	৫.২%
১৯৮৪	৫৪৪	৮.১%
১৯৮৯	৫১৭	৫.২%
১৯৯১	৫৪৪	৭.২%
১৯৯৬	৫৪৩	৭.২%
১৯৯৮	৫৪৩	৭.৯%
১৯৯৯	৫৪৫	৮.৬৫%
২০০৪	৫৪৩	৮.১৬%

প্রতিনিধি---এই হল সাম্যবাদীদের দৃষ্টিকোণ ও ব্যবহার। ফোবর্স পত্রিকার সমীক্ষায় ২০০৭ ও ২০০৮ সালে কংগ্রেস দলের সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী পৃথিবীর প্রথম একশোজন প্রভাবশালী মহিলাদের মধ্যে পরিগণিত। তিনি নববই-এর দশকে স্বামী রাজীব গান্ধীর মৃত্যুর পর রাজনীতির আঙিনায় প্রবেশ করেন। ১৯৮৪ সালে শিক্ষকতা (প্রাথমিক) ছেড়ে রাজনীতিতে এসে মায়াবতী বর্তমানে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এবং ২০০৭-০৮ সালে তার ব্যক্তিগত সম্পত্তির পরিমাণ মাত্র ২৬ কোটি টাকা। এ ছাড়া শীলা দীক্ষিত, জয়ললিতা ও মমতা ব্যানার্জিও রাজনৈতিক

ক্ষেত্রে অনেকবার ক্ষমতাশালী মহিলা হিসেবে গণ্য হয়েছেন।

এতসব সত্ত্বেও ভারতের সংসদে মহিলা আসন সংরক্ষণ আইন পাস হয়নি। ১৯৯৬ সালে দেবেগৌড়ার আমলে এই আইন এর খসড়া তৈরি করা হয়েছিল। সিপিআই নেত্রী

গীতা মুখার্জির নেতৃত্বে সংসদীয় সমিতি তা ১৯৯৬ সালেই সংসদে পেশ করলেও তা মঞ্জুর হয়নি। এন ডি এ আমলে ১৯৯৮, ১৯৯৯, ২০০২ এবং ২০০৩ সালে আইনটি পাস করানোর চেষ্টা হলেও বিরোধীদের অসহযোগিতায় তা পাস হয়নি। গত বৎসর ইউ পি এ আমলে বিভিন্ন মহিলা সংগঠনের চাপে তা আবারও সংসদে পেশ হয়। সরকার কংগ্রেসী সাংসদ ই এম সুদর্শনের নেতৃত্বে গঠিত সংসদীয় সমিতিকে তা জমা দিয়েছে। ফলে আগামী লোকসভার আগে আর কিছুই করা যাবে না।

বিজেপি-র নিজস্ব নির্বাচনী ইস্তাহার

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টি তাদের নির্বাচনী ইস্তেহারে অনান্য বারের মতো এবারও রাষ্ট্রীয় হিতের বিষয়গুলিকেই বেশি প্রাধান্য দিয়েছে। ভোট স্বার্থের উর্দ্ধে ওঠে এবারও জাতীয় বিষয়গুলিই বেশি গুরুত্ব পেয়েছে তাদের ইস্তাহারে।

রামমন্দির থেকে ৩৭০ ধারা বিলোপের বিষয়কেও ইস্তেহারে সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় জনতা পার্টি তাদের এবারের নির্বাচনী ইস্তেহারে যে বিষয়গুলিকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছে সেগুলি হল —

☞ রামমন্দির নির্মাণের গৃহীত প্রস্তাব কার্যকর করা।

☞ রামসেতুকে জাতীয় স্মারক হিসাবে ঘোষণার দাবি।

☞ ৩৭০ ধারা বিলোপের দাবি।

☞ গোহত্যা ও ধর্মান্তরকরণের ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞার দাবি।

☞ অভিন্ন দেওয়ানী বিধি চালুর গৃহীত প্রস্তাব বাস্তবায়িত করা।

বহুমুখী পরিচয়পত্র

লোকসভা ২০০৯-এর নির্বাচনে জনাদেশ যদি এন ডি এ-র পক্ষে যায় তবে তিন বছরের মধ্যেই বহুমুখী পরিচয় পত্র চালু করা হবে। সম্প্রতি এন ডি এ-র প্রধানমন্ত্রী পদ প্রার্থী এল কে আদবানী একথা জানিয়েছেন। সাধারণ মানুষকে তখন আর আত্মপরিচয়ের জন্য বহু তথ্য বয়ে বেড়াতে হবে না। আইন -রক্ষকরাও তখন যে কারও পরিচয়পত্রের বৈধতা সঙ্গে সঙ্গেই পরীক্ষা করে দেখতে পারবেন। বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের পরিপ্রেক্ষিতে এই বহুমুখী পরিচয়পত্রের খুবই প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

বাংলা সংবাদ মাধ্যম

প্রতিটি সচেতন 'দেশভক্ত' বাঙালি পাঠকের কাছে বাংলা সংবাদপত্র ও বৈদ্যুতিন মাধ্যমের সাম্প্রতিক ভূমিকা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার ও উজ্জ্বল। কিন্তু যেখানে দেখা যাচ্ছে সংবাদপত্র ও বৈদ্যুতিন মাধ্যমের যথার্থ প্রতিপাদ্য 'নিরপেক্ষতা', প্রকৃত 'সত্য ঘটনা ও তথ্য উত্থাপন', বিভিন্ন 'ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বক্তব্য' তুলে ধরা, 'চটুল সংস্কৃতি ও সঙ্গীতের' পরিবর্তে 'সুস্থ, রুচিশীল, স্বদেশ ও সমাজের কল্যাণকর পরিবেশনার' বিন্দুমাত্র নেই, সেখানে নীরবতা মোটেই সমীচীন নয়! সাম্প্রতিক সময়ে সকল ধরনের বাংলা সংবাদ মাধ্যমে মত প্রকাশের স্বাধীনতার এরকম অপব্যবহার কল্পনাতীত ও গভীর বেদনাদায়ক। ফলে শিক্ষা-সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক কোনও বিষয়ে যথার্থ 'জনমত' গড়ে উঠেছেনা। এক 'ধোঁয়াশার' পরিমণ্ডলে পাঠকদের ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে। বাণিজ্যিক, ব্যক্তি স্বার্থ ও সংকীর্ণ দলীয় প্রতিষ্ঠা ও প্রচারই বাংলা মাধ্যমের বর্তমান অভিমুখ। এভাবে সংবাদ প্রচার চললে সত্যসন্ধানী পাঠকেরা বাংলা-মিডিয়া হতে অচিরেই বিমুখ হতে বাধ্য।

অতীতের বাংলা সংবাদ-জগতের প্রসঙ্গ স্বাভাবিকভাবেই স্মরণে এসে পড়ে। অধুনালুপ্ত 'দৈনিক বসুমতী' ও 'যুগান্তরের' সর্বব্যাপক উজ্জ্বল, বলিষ্ঠ ভূমিকা বাংলা তথা ভারতের সংবাদপত্র জগতে এক গৌরবের ইতিহাস। মনে পড়ে যায় 'যুগান্তরের' একটি সম্পাদকীয়--'বিলাসপুরের চিন্তাবিলাসীরা'। সম্পাদক মহোদয় (বিবেকানন্দ মুখার্জি) সেই সময় ভারতীয় জনসংঘের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে আচার্য দেবপ্রসাদ ঘোষের 'সভাপতির ভাষণের' নীতিনিষ্ঠ রাজনৈতিক বিশ্লেষণ করেছিলেন। কোনও একপেশে মনোভাব দেখিয়ে 'সভাপতির' মূল্যবান বক্তব্যকে বিকৃত, তুচ্ছ ও নিম্নগামী করেননি। আজও সেই পরিচ্ছন্ন, নীতিনিষ্ঠ সাংবাদিকতার চিত্রটি চোখের সামনে স্বতঃই ভেসে ওঠে। তাই সব ধরনের বাংলা প্রচার মাধ্যমের কাছে আবেদন রাখি পূর্বের সংবাদ-বন্ধুদের ধারা খানিকটা ফিরিয়ে আনুন আপনাদের কাজকর্মে।

--রণজিৎ সিংহ, কলকাতা-৭০০০৩৬।

জঙ্গিবাদের উৎস

মুসলমানদের অটল বিশ্বাস------পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোরান আল্লার বাণীর সংকলন গ্রন্থ এবং এ কোনও মানুষের রচনা নয়, স্বয়ং আল্লাই এ গ্রন্থের রচয়িতা। তাই সঙ্গতকারণেই মুসলিম সমাজে কোরানের বাণীর মর্যাদা ও মান্যতা সর্বোচ্চ। ধর্মগ্রন্থ কোরানে উল্লেখ আছে, আল্লা ছাড়া আর কোনও উপাস্য নেই এবং মুসলমানরা কেবল আল্লাকেই উপাসনা করেন ও তাঁরই কাছে সাহায্যে প্রার্থনা করেন (সুরা ১, আয়াত ৪)। যারা আল্লা ছাড়া অন্যকে কিংবা আল্লাসহ অন্যকে উপাসনা করেন তারা অংশীবাদী। অংশীবাদীরা অবিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসীরা অমুসলমান। অমুসলমানদের মুক্তি নেই। রোজ কেয়ামতের (মহাপ্রলয়) দিনে সর্বশক্তিমান আল্লা অবিশ্বাসীদের অবশ্যই চরম শাস্তি দেবেন। পক্ষান্তরে হিন্দুদের অন্যতম ধর্মগ্রন্থ গীতায় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন--যিনি ভগবানকে পূজা করেন তিনি ভগবানকেই প্রাপ্ত হন এবং যিনি সশ্রদ্ধ ভাবে অন্য দেবগণকেও পূজা করেন, তিনি অবিধিপূর্বক ভগবানকেই পূজা করে থাকেন (গীতা, অধ্যায় ৯, শ্লোক ২৩ এবং ২৫)। তাই প্রত্যক্ষভাবে ও বহুরূপে ভগবানকে পূজনকারী হিন্দু, যিনি ভারতে কিংবা বহির্ভারতে যেখানেই বসবাস করুন, কখনও সাম্প্রদায়িক হন না বা হতে পারেন না। বরং যাঁদের এক ধর্মগ্রন্থ এক উপাস্য তাঁরাই সাম্প্রদায়িক।

আজ বিশ্বের প্রায় সমস্ত রাষ্ট্রের কাছেই জ্ঞাত যে বিশ্বে মুসলমান জঙ্গিবাদের আঁতুড়ঘর পাকিস্তান এবং পাকিস্তানই সমস্ত প্রকার প্রশিক্ষণ, অস্ত্র-শস্ত্র, অর্থ ও আশ্রয় দিয়ে জঙ্গিদের সর্বদা সাহায্য করে চলেছে। অবশ্য জঙ্গিরা যে নৃশংস নাশকতামূলক কার্যকলাপ করে চলেছে এবং পাকিস্তানও সর্বোতভাবে আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়ে চলেছে তার অন্যতম মূল উৎস একটি বিশেষ ধর্মগ্রন্থের বিশেষ বিশেষ বাণী। ওই বিশেষ ধর্মগ্রন্থ থেকে অন্য ধর্মের প্রতি যে সমস্ত ঘৃণা ও বিদ্বেষমূলক আয়াত আছে তা অবিলম্বে পরিত্যাগই হবে বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে বুদ্ধি মত্তা ও বিচক্ষণতার প্রকৃষ্ট পরিচয়। জঙ্গিরা জঙ্গিই —তারা কখনই মানবাধিকার পেতে পারে না। জঙ্গিদের বিনাশসাধন অন্যতম রাজধর্ম। বিশ্ব নেতৃত্বকে অবিলম্বে জঙ্গিবাদের উৎস ও আঁতুড়ঘরসহ সমস্ত জঙ্গিকে সমূলে বিনাশ করতে হবে— অন্যথায় পরিস্থিতির প্রবলতম প্রতিক্রিয়ায় গোটা বিশ্ব এক ভয়াবহতম রণাঙ্গনে পরিণত হয়ে যেতে পারে।

--ডঃ সুশীলকুমার সরকার, উত্তর ব্রহ্মপুর, নদীয়া

বাংলাদেশে সেই অশুভ শক্তি

হায় বাংলাদেশ! পূর্বতন ভারতের খণ্ডিত অংশ পূর্ব পাকিস্তানের জঠরে জন্ম নেওয়া এক নবীন বাংলাভাষী গণতান্ত্রিক দেশ। ১৯৭১-এ ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গেই, কপালের লিখনে কি ছিল অদৃষ্ট। আর পাঁচটা শিশুর মতো সে বাড়তেই পারল না কখনও। ঠিক যেমন একদা 'শস্যশ্যামলা রূপসী' অবিভক্ত বাংলায় ঘটেছিল ১৯৪৬ সালে--প্রথম রক্তলোলুপের ধ্বংসাত্মক লেলিহান শিখা গ্রাস করে নিয়েছিল, একদা মেঘনা নদীর তীরে নারিকেল সুপারী পরিবেষ্টিত শান্ত স্নিগ্ধ 'নোয়াখালি'।

সম্প্রতি বাংলাদেশের বি ডি আর-এর সদর দপ্তর পিলখানায় বি ডি আর জোয়ানদের দ্বারা সংগঠিত সেনা কর্তা ও তাদের পরিবারবর্গের নির্মম গণহত্যার পিছনে যে শক্তি আছে, সেই একই শক্তি ১৯৪৬-এর কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর দিন সংগঠিত নোয়াখালির 'রায় সাহেব' রাজেন্দ্রলাল রায়চৌধুরীর পরিবারের হত্যাকাণ্ডে বা ১৯৭১ মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতায়ও ছিল। এই শক্তি কোনওমতেই বাংলাকে রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, সত্যেন্দ্রনাথ, বা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়চৌধুরীর বংশধর হয়ে, আজও ঘটনাগুলোর মধ্যে যোগসূত্র খুঁজে পাই।

আজকের এই গণহত্যার পিছনে যাই যুক্তি দেওয়া হোক না কেন, একথা প্রমাণিত যে, এর পিছনে পূর্বতন পশ্চিম পাকিস্তানের একটা শক্তির সমর্থন ও উসকানি আছে;যে শক্তিটা বাংলাদেশে তার ষড়যন্ত্র-জাল ক্রমশ বিস্তার করে চলেছে। এরাই বাংলাদেশ ও ভারতের উত্তর পূর্বের 'সপ্তবোন' (Seven Sisters) রাজ্যগুলিকেনিয়ে এক নয়া মুঘলস্থান গঠনের পরিকল্পনা নিয়ে এগোচ্ছে। এই শক্তির পিতৃস্থানীয় গোলাম সারোয়ার ১৯৪৬ সালের ১০ অক্টোবর নোয়াখালিতে 'দার-উল-ইসলামে' পরিণত করার জন্য সেখানকার বর্ধিষ্ণু জমিদার রাজেন্দ্রলাল রায়চৌধুরী ও সুরেন্দ্র কুমার বোস প্রমুখের বাড়ির লোকজনসহ আশ্রিত গ্রামের হিন্দুদের অগ্নিসংযোগ ও গলা কেটে হত্যা করে শক্তির প্রদর্শন করেছিল। নিরীহ নিরপরাধ নিরস্ত্র হিন্দুদের উপর সেদিন যে ধরনের গণহত্যা হয়েছিল, তা আজকের বিভীষিকা থেকে কোনও অংশে কম নয়। রায় সাহেবের মাথা রুপোর থালায় সাজিয়ে গোলাম সরোয়ার উপঢৌকন পান;আর তার বিশ্বস্ত সেনাপতি লাভ করে রায়সাহেবের দুই সুন্দরী কন্যাকে। যাদের খোঁজ আজও নেই। ওই রায়চৌধুরী বাড়ির আজও কত নারী-পুরুষ নিখোঁজ তার কোনও হিসেব নেই।

সেইজন্য, বাংলাদেশের গণতন্ত্র ওই অশরীরী শক্তির পদানত হলে এরকম ঘটনা ঘটিয়েই ছাড়বে। ভারতের বিশেষ করে আমাদের পশ্চিম-বঙ্গের এবিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত 'ভোট ব্যাঙ্ক' রাজনীতি ভুলে গিয়ে। কেননা, প্রতিবেশীর ঘরে আগুন লাগলে তা না নিভালে ঘর কতক্ষণ অক্ষত রাখা যায়?

---শিবাশীষ রায়চৌধুরী, ধুবুলিয়া, নদীয়া।

মেমারীর মুখ্য ডাকঘর

মেমারীর মুখ্য ডাকঘরের বেশ কিছু অব্যবস্থা সম্পর্কে দু'চার কথা। কেন্দ্র সরকারের অধীন এই ডাকঘরে সরকারি উদাসীনতায় সময়ে টাকা পাওয়া যায় না। কেন্দ্র সরকারের তুঘলকী নীতির জন্য যে-কোনও সার্টিফিকেট ভাঙানোর সময় (২০০০০.০০) কুড়ি হাজারের ওপর পাওনা হলে আমাদের মতো বয়স্ক নাগরিকসহ সকলকে চেক দেওয়া হচ্ছে, যা ভাঙাতে বেশ কিছু সময় লাগার ফলে আর্থিক দিক থেকে খুবই অসুবিধা ভোগ করতে হয়। শুধু কি তাই— মাসিক সঞ্চয় প্রকল্পে একে সুদ কম, তার ওপর সরকার বোনাস যে শতকরা ১০ ভাগ দিচ্ছিল তা বন্ধ করার পর আবার যে দেওয়া শুরু করেছে তা শতকরা ৫ ভাগ। উত্তরোত্তর এই ভাবে সুদ কমানোর ফলে মাসিক সঞ্চয় প্রকল্প থেকে পাওয়া সুদ থেকে যে সকল বয়স্ক নাগরিকদের একমাত্র জীবিকার উৎস তাদের অবস্থা খুবই করুণ। কংগ্রেসী কেন্দ্রীয় সরকারের এখন পশ্চিমবঙ্গের কলকাতার কালীঘাটের হকারদের মতো অবস্থা। এই সরকারের আমলে জিনিসপত্রের দাম হু-হু করে বেড়েই চলেছে। নির্বাচনের সময় এরা ১০ টাকা বাড়িয়ে পরে মাত্র ২ টাকা কমিয়ে নিজেরাই হাস্যাস্পদ হচ্ছে। ডাকঘরে বেশ কিছুদিন ধরে টাকার অকুলান চলছে। কারণ হিসাবে জানা গেল, ব্যাঙ্কগুলি ডাকঘর থেকে অনেক পরিমাণ বেশি সুদ দিচ্ছে। তাই আমানতকারীগণ তাদের স্থায়ী জমা আমানত তুলে নিয়ে ব্যাঙ্কে জমা দিচ্ছে বেশি সুদের জন্য। ডাকঘরে সুদ শতকরা আট টাকা যেখানে সাধারণ ব্যাঙ্কে সুদ ৯.৭৫ এবং বয়স্ক নাগরিকদের জন্য ১০.৫ টাকা সুদ। সেজন্য ডাকঘরে লগ্নির টাকা প্রায় প্রতিদিন বিপুল পরিমাণে তুলে নিয়ে ব্যাঙ্কে জমা হয়ে যাচ্ছে।

মেমারী মুখ্য ডাকঘরের অবস্থাও খুবই করুণ। প্রথমত কর্মী কম। দ্বিতীয়ত, প্রায় দিন কাউন্টারের জানালায় নোটিশ টাঙানো থাকে 'টাকা নেই' এবং এইরূপ অব্যবস্থা চলছে মাসাধিককাল ধরে। নাগরিকরা ও সাধারণ উপভোক্তাগণও অসুবিধার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন টাকা না থাকার জন্য। গত ৩ জানুয়ারি ক্যাশ কাউন্টার চালাবার জন্য কর্মীরা মাসান্তে তাদের মাসিক মহিনার টাকা না নিয়ে সেই দিয়ে কাউন্টার চালিয়েছে। স্থানীয় নাগরিকরা টাকা পাওয়ার জন্য সমস্ত টাকা তুলে নিয়ে ব্যাঙ্কে জমা দেবে। ফলে ডাকঘরের অবস্থা আরও করুণ পর্যায়ে চলে যাবে। শুধু তাই নয়, বার্ষিক সুদ কষার জন্য পাশ বই জমা দিলে তা বর্ধমান চলে যায়। পাওয়া যায় তিন থেকে ছয় মাস পরে। ফলে উক্ত সময়ে টাকা লেনদেন-এর বিরাট অসুবিধা হয়। প্রশ্ন করলে বর্ধমান জেলা ডাকঘর থেকে উত্তর আসে ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে কর্মীরা ব্যস্ত, সুতরাং দেরি একটু হবে। কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের ভ্রান্তনীতি ও তুঘলকী কারবারের জন্য ডাকঘরের পুরো ব্যবস্থা অব্যবস্থাতে পরিণত হতে চলেছে। সুতরাং মেমারী মুখ্য ডাকঘরের ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ, মেমারীসহ সকল ডাকঘরকে অর্থনৈতিক স্বাবলম্বী করে গ্রাহকদের অসুবিধা দূর করা হোক। নাহলে আবারও ধর্মঘট করে ডাক ব্যবস্থা বন্ধ হলে ব্যাপারটি সুখের হবে না।

--দেবপ্রসাদ সরকার, মেমারী, বর্ধমান-৭৪১২৫৭।

চিঠিপত্র

মাথাভাঙ্গা সারদা শিশুতীর্থের রজত জয়ন্তী

কিছু তরুণের অদম্য উৎসাহ ও আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে ১৯৮৫ সালে মাথাভাঙ্গা শহরে 'সারদা শিশুতীর্থ' শিক্ষার ক্ষেত্রে যে নবদিগন্তের সূচনা করেছিল, গত ২৪ ফেব্রুয়ারি তা ২৫ বছরে পদার্পণ করল। রজত জয়ন্তী বর্ষের বর্ষব্যাপী নানান কর্মসূচীর অঙ্গ হিসাবে বিদ্যালয়ের ২৫তম প্রতিষ্ঠা দিবসে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা সমগ্র শহর পরিক্রমা করে।

বর্তমান ও প্রাক্তন বিদ্যার্থী, অভিভাবক ও মাথাভাঙ্গার শিক্ষানুরাগী মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এই শোভাযাত্রাকে আরও বর্ণময় করে তুলেছিল। শোভাযাত্রায় সামিল হয়েছিলেন ক্ষিতীশ চন্দ্র সরকার (সম্পাদক, বিদ্যাভারতী, উত্তরবঙ্গ), পার্থ ঘোষ (সংগঠন সম্পাদক, বিদ্যাভারতী, উত্তরবঙ্গ), তুলসীদাস সরকার (সভাপতি, সারদা শিশুতীর্থ, মাথাভাঙ্গা), বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডঃ তুষারকান্তি চক্রবর্তী, সতীশ চন্দ্র বর্মন প্রমুখ।

সমাবেশ সমাচার

জ্যোতির্ময় চৈতন্য মহারাজের জন্মদিবস পালিত

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের হুগলী বিভাগ সঙ্ঘচালক তথা রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, প্রয়াত ব্রহ্মচারী জ্যোতির্ময় চৈতন্য মহারাজের জন্মদিবস গত ২৮ ফেব্রুয়ারি দ্বারহাট্টায় পালিত হল। তাঁর মর্মর মূর্তিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেন তাঁরই সহকর্মী বৃন্দাবন ঘোষ।

এদিন লায়ন্স ক্লাবের সহযোগিতায় রক্তদান, চক্ষু পরীক্ষা শিবির, শিশু স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির ও নিউরো চিকিৎসা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। সকলের উপস্থিতিতে এবং আগ্রহে দ্বারহাট্টায় ব্রহ্মচারী জ্যোতির্ময় চৈতন্য শিশুমন্দির স্থাপনের সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক কেশবরাও দীক্ষিত, প্রান্ত প্রচারক রমাপদ পাল, প্রান্ত প্রচারক প্রমুখ প্রদীপ দে, নরেশ দারুকা প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। সমস্ত অনুষ্ঠানটি পরিচালনা ক রেন তাঁরই ছাত্র অদ্বৈতনাথ দে।

প্রয়াগের কিংবদন্তী দেববিগ্রহ বড়ে হনুমানজী

সোমনাথ নন্দী

সনাতন হিন্দুধর্মে নানা পথ নানা ভাবের সাধনার কথা বলা হয়েছে। ভক্তিপথের পথিকরা আশ্রয় করেন পঞ্চ রসের। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাবের সাধনাই হল পঞ্চ রসের পাঁচ উপাদান। পঞ্চ ভাবের এই সাধনায় লাভ হয় ভগবদ্ সাযুজ্য বা সামীপ্য। অবশ্যই অবস্থা ভেদে।

শাস্ত্রে বলা হয়েছে জ্ঞানযোগ অবলম্বনে ঘটে ব্রহ্মনির্বাণ। যা ভক্তিপথের ঈশ্বর সাযুজ্যের তুল্য। ভারতের গরিষ্ঠ সংখ্যক সাধক জ্ঞান বা যোগপথের থেকে ভক্তিকেই বেছে নিয়েছেন ঈশ্বর লাভের মাধ্যমরূপে। তবে পঞ্চ রসের মধ্যে আবার দাস্য ও মধুর ভাবের ব্যবহার সর্বাধিক। তুলসীদাস, মীরা, কবীর, সুরদাস, তুকারাম, শ্রীচৈতন্য থেকে শুরু করে হাল আমলের শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, বলরাম স্বামী, সন্তদাস কাঠিয়াবাবা প্রমুখ মহাপুরুষদের সাধন-জীবনে উক্ত দুই ভাবের প্রভাব বিশেষভাবে দেখা যায়। এই দুয়ের মধ্যে বৈষ্ণব সাধকদের মধ্যে আবার দাস্যভাবের প্রভাব বেশি।

দাস্যভাবের জীবন্ত প্রতিমূর্তি হলেন ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীহনুমান। আর মধুর ভাবের আদর্শ প্রতিমা শ্রীরাধা। ভারতের ভক্তি আন্দোলনে বহুকাল ধরে উক্ত দুই রসের প্রতিভূস্বরূপ দুই বিগ্রহ বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে। কিন্তু দাস্য ভাবের সীমা অবশ্য আরও ব্যাপক। সমস্ত বৈষ্ণবসাধক ইষ্ট ব্যতিরেকে দীক্ষান্ত কালে দাস উপাধিযুক্ত হন। যেমন কৃষ্ণদাস, রামসুখদাস, নিত্যগোপাল দাস প্রমুখ।

শ্রীহনুমানকে দাস্যভাবের প্রতীক হিসাবে ধরার অন্যতম কারণ তাঁর নিরন্ধ্র শ্রীরামশরণাগতি। বিদ্যা, বুদ্ধি, পরাক্রমে, বলবীর্যে তিনি শ্রীরামতুল্য হয়েও নিজেকে শ্রীরামের সেবক রূপে ভাবতে ভালোবাসতেন। নিজের অমিত যোগবিভূতি ও প্রবল পরাক্রমকে রামনামের দিব্য আভরণ বলতে কুণ্ঠিত হননি। বস্তুত শ্রীরাম বা রামনামের প্রতিষ্ঠার মুলেই শ্রীহনুমানের ত্যাগোজ্বল ও শরণাগতিময় জীবন। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর কথামৃতে দাস্যভক্তি প্রসঙ্গে

শ্রীহনুমানের উপমা টেনেছেন—"হনুমানকে জিজ্ঞাসা করা হল আজ কি বার, কি তিথি, কি নক্ষত্র। হনুমান বললেন, ওসব জানি না। আমি শুধু শ্রীরামকেই জানি। কথার কথা নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ দাস্য ভক্তি সাধনকালে হনুমানের পথকেই অনুসরণ করেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ শিষ্য বিবেকানন্দের মহাবীর অনুরক্তি ছিল অপরিসীম। ভারতের পুনরুত্থানের উপায় হিসাবে হনুমানের পদাঙ্ক অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছিলেন। বলেছিলেন---"দেশটাকে তুলতে হলে মহাবীরের পূজা চালাতে হবে। শ্রীরামের পূজা ঘরে-ঘরে করতে হবে। তবেই তোদের ও দেশের কল্যাণ। নতুবা উপায় নাই।"

ভারতে কেদারনাথ থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত যত দেবালয় দেখা যায়, তার অধিকাংশ শিব-পাবর্তী, বিষ্ণু, কৃষ্ণ ও শ্রীরামের অধিকারে। ব্যতিক্রম একমাত্র হনুমান। সারা ভারতে সংখ্যার নিরিখে হনুমান মন্দির প্রায় সমসংখ্যক। কালকাতা তো বটেই গ্রাম বাংলার প্রতি এক কিলোমিটারের মধ্যে দেখা যাবে চার বা ততোধিক ছোট-বড় হনুমান মন্দির বা থানের অস্তিত্ব।

প্রয়াগে সঙ্গম যাওয়ার পথে ত্রিবেণী বাঁধ এলাকায় বড়ে হনুমানজীর মন্দির তো কিংবদন্তীর স্তরে। এলাহাবাদ কেল্লার প্রায় কোল ঘেঁসে স্থানটি। ভক্ত-তীর্থযাত্রীদের প্রথম দর্শনের বস্তু যদি ত্রিবেণী সঙ্গম হয়, পরবর্তী স্থান অবশ্যই বড়ে হনুমানজীর মন্দির।

প্রত্নতাত্বিকরা মনে করেন বড়ে হনুমানজীর এই মন্দিরের বয়স পাঁচশো অতিক্রম করে গেছে। ১৫৮৩ সালে বর্তমান এলাহাবাদ মোগল বাদশা আকবর কর্তৃক পুনর্গঠিত হয়। দুর্গ নির্মাণের সময় স্থান সংলগ্ন যেসব ছোট মন্দির ছিল, তা ভাঙা পড়ে। সম্রাটের আদেশে তা দুর্গের মধ্যে পাতালপুরী মন্দিরে সযত্নে পুনরায় প্রতিষ্ঠা করা হয়। ব্যতিক্রম ছিল কেবল হনুমানজীর ১০ ফুট দৈর্ঘ্যের বিশাল শায়িত মূর্তি। সম্রাটের লোকজন মূর্তিটিকে শত চেষ্টা করেও স্থানচ্যুত করতে পারেনি। সেজন্য বড়ে হনুমানজীর বিগ্রহ থেকে যায় সেখানে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর ত্রিবেণী বাঁধের সংস্কার কালে আরেকবার চেষ্টা হয় মূর্তি স্থানান্তরের। তাও বিফল হয়। মূর্তিটিকে কেন্দ্র করে প্রচলিত জনশ্রুতি হল বহুকাল আগে জনৈক বানিয়া (ব্যবসায়ী) নিজের কোনও সন্তানাদি না থাকায় মূর্তিটি বানিয়ে নদীপথে যাচ্ছিলেন নিজ গ্রামে। ইচ্ছা ছিল, হনুমানজীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে তাঁর সেবায় বাকী জীবন কাটাবেন।

গঙ্গা তখন বইত বাঁধ সংলগ্ন এলাকা দিয়ে। যদিও সে ধারা এখন সরে গেছে পূর্বদিকে।

নৌকা আজকের মন্দির স্থানে আসতেই আটকে যায় চড়ায়। বহু চেষ্টা করেও তাকে সচল করা গেল না। সে রাতে বানিয়া স্বপ্নে দেখলেন হনুমানজী তাঁকে বলছেন, নৌকো আটকানোর স্থানে পাড়ের ওপর তার মূর্তি রেখে দেওয়ার জন্য। এতেই তাঁর কামনা সিদ্ধ হবে। বানিয়া তাই করলেন। মূর্তিকে পাড়েই রেখে গেলেন।

কালান্তরে মূর্তি একদিন চলে যায় মাটির গর্ভে। বাঘম্বরীবাবা নামে এক সাধক প্রয়াগে আসেন কুম্ভস্নানে। সম্ভবত সম্রাট আওরঙজেবের সময়। ত্রিবেণী বাঁধ এলাকায় আসামাত্র যোগবলে প্রত্যক্ষ করেন তিনি মৃত্তিকা গর্ভে শায়িত হনুমান মূর্তিকে। লোকজন দিয়ে মাটি সরিয়ে বাবা দেখতে পান বিশাল হনুমানজীর বিগ্রহটিকে। শায়িত মূর্তিকে তোলা সম্ভব হয়নি। শায়িত মূর্তির ওপরই তিনি বর্তমান মন্দির তৈরি করেন। অনুমান করা হয়, আকবরের সময় এ মন্দিরের আকার ছিল ছোট।

বাঘম্বরীবাবা মূর্তিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন এবং সেবার জন্য পাকাপাকিভাবে রয়ে যান। পরবর্তীকালে তাঁর শিষ্যরাই সেবার অধিকারী পরম্পরাগতভাবে। তাই বলা হয় মন্দির বাঘম্বরী বাবার গদির সম্পত্তি।

মন্দিরটি আয়তনে দৈর্ঘ্যে ৪০ ফুট ও প্রস্থে ৩৫ ফুট, উচ্চতা ৩০ ফুট। সাদা পাথরের সাদামাটা মন্দির। কারুকার্য নেই বললেই চলে। প্রতি শনি ও মঙ্গলবার মন্দির ভক্ত ও দর্শনার্থীদের ভিড়ে জমজমাট হয়ে ওঠে। 'বজরংবলী হনুমানজী কী জয়'---ভক্তদের এই জয়ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে ত্রিবেণী।

আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে অর্শ ও ভগন্দর চিকিৎসা

রবীন সেনগুপ্ত

গরুড় পুরাণ শাস্ত্রের ১৬০ অধ্যায়ে শ্রীবিষ্ণুর অবতার ধন্বন্তরী-সুশ্রুতকে বলছেন--অথাশসাং নিদানঞ্চ ব্যাখ্যা-স্যামি চ সুশ্রুত। অবিমাৎ প্রাণিনাং মাংসে কীলকাঃ প্রভবন্তি যৎ। অর্শাংসি তসমাদুচ্যন্তে গুদর্মাগানরোধনৎ।।

এর অর্থ হল— প্রাণীদের দেহে প্রায়ই নানা ধরনের ব্রণ বা ফুস্কুড়ি নিগর্ত হয়। যদি মলদ্বারের মার্গ নিরোধ করে এই সকল কীলক উৎপন্ন হয় তাকেই অর্শ বলে। ইংরেজিতে একে বলা হয় পাইলস্। আর যদি মলদ্বারের ভিতরে ঘা উৎপন্ন হয় তাহলে তাকে বলে ভগন্দর বা ফিশ্চুলা।

যকৃত দোষের সঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধতার মিলন ঘটলে অর্শ হতে পারে। ঘোড়া, সাইকেল, ইত্যাদি যানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আরোহন করলে অর্শ হতে পারে। মল যথাসময়ে ত্যাগ না করে চেপে রাখার প্রবণতাও এই রোগের কারণ হতে পারে। আর গর্ভপাত ও গর্ভবৃদ্ধির পীড়ার কারণে (স্ত্রী লোকের ক্ষেত্রে) অর্শ দেখা দেয় অনেক সময়।

বাতপিত্তজ অর্শ রোগে যে বলি উৎপন্ন হয় তাতে শুষ্ক ভাব থাকে। কদন্নভোজন থেকে সন্নিপাতিক অর্শ জন্মাতে পারে। সহোত্থ-অর্শ খুবই রুক্ষ, পাণ্ডুবর্ণের ও যন্ত্রণাদায়ক হয়ে থাকে। অর্শরোগের গুটিকাগুলি নানা আকৃতি-প্রকৃতির হয়ে থাকে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে গুটিকা ফেটে রক্তক্ষরণও হতে পারে। সরিষার মতো আকৃতির অর্শ গুটিকা, কুলের বীচি, বা কদম ফুলের ধরনের অর্শ গুটিকাও হতে পারে। মেট্রাদিজ ও নাভিজ অর্শের অঙ্কুর, কিঞ্চি লুকের (কেঁচোর) মুখের মতো পিচ্ছিল ও কোমল হয়।

অর্শসাং প্রথমে যত্নমাশু কুর্বীত বুদ্ধিমান। তান্যাশু হি গদং কার্য্যং

কুর্যুরুদ্ধগুদোদরম্। অর্থাৎ অর্শ রোগ প্রথম প্রাদুর্ভাবেই চিকিৎসা না করালে তার থেকে অন্ত্রে ও অন্যত্র অন্য ব্যাধির সৃষ্টি হতে পারে। এই হল আয়ুর্বেদের উপদেশ।

এখন অর্শ ও ভগন্দরের জন্য প্রাচীন সনাতন শাস্ত্রে কী-কী উপায় প্রদত্ত আছে সেদিকে যদি দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, তাহলে দেখতে পাব যে, এই ব্যাধিটির জন্য বাহ্যিক ঔষধ প্রয়োগ বা মলমের ব্যবহার যেমন ছিল তেমনই প্রয়োজনে অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থাও ছিল।

যোগাসন চিকিৎসার ক্ষেত্রে অর্শরোগের নিদান হিসাবে প্রতিদিন তিনবার টাব-বাথ গ্রহণ এবং টাবে বসে অশ্বিনীমুদ্রা ও মূলবদ্ধ মুদ্রা অভ্যাস করার ব্যবস্থা দেওয়া আছে। আর ভগন্দরের ক্ষেত্রেও উক্ত আসনগুলি তো রয়েছেই তার সঙ্গে সহজ অগ্নিসার ৫০ বার, বমনধৌতি বা বারিসার সপ্তাহে দুই দিন করার নিদান প্রদত্ত রয়েছে। খাদ্য গ্রহণের ক্ষেত্রেও যথারীতি নানাবিধ নির্দেশিকা অর্শ ও ভগন্দর নিবারণের জন্য শাস্ত্রে রয়েছে। লঘু পথ্য নিরামিষ খাদ্য সমূহকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

অভয়ানবনীতঞ্চ শর্করাপিপ্পলীযুতম। পানাদর্শো হরং স্যাচ্চ নাত্র কার্য্যা বিচরণা। --এই শ্লোকটি থেকে জানা যাচ্ছে যে-- হরিতকী, নবনীত, শর্করা, পিপ্পলী এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে একত্র করে ভক্ষণ করলে অর্শরোগ নাশ পায়।

গুগ্গুলু ত্রিফলাযুক্ত পীত্বা নশ্যেদ ভগন্দরম্। এই শ্লোকটি বলছে যে গুগগুল ও ত্রিফলচূর্ণ দ্বারা প্রস্তুত ঔষধ ভগন্দর রোগ নাশে সহায়তা করে থাকে।

আয়ুর্বেদ আচার্যগণ একটি মলমের ফর্মূলা আমাদের জন্য প্রদান করেছেন যা অর্শ রোগাক্রান্ত স্থানে লেপন করলে সুফল মেলে। অটরূষক পাত্রেন ঘৃতং মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ। চূর্ণং কৃত্বা তু লেপোহয়ং অর্শোরোগহরঃ পরঃ। অর্থাৎ বাসকের পাতা ঘৃতের সঙ্গে মৃদু অগ্নিতে পাক করে ওই পাতা চূর্ণ করে লেপন প্রস্তুত করে অর্শদগ্ধ স্থানে প্রয়োগ করতে হবে।

দণ্ডিমূলং হরিদ্রা চ চিত্রকং তস্য লেপনাৎ। ভগন্দর বিনাশঃ.....এই সংস্কৃত শ্লোক থেকে জানা যায় যে দণ্ডিমূল, হরিদ্রা, চিতা এই সমস্ত দ্রব্য একত্রে পেষণ করে প্রলেপ দিলে ভগন্দর রোগ বিনষ্ট হয়।

ঘোষাফল ও সৈন্ধব একত্রে পেষণ করে লেপন করলে অর্শ নিরাময় হয়। পলাশ বৃক্ষের ক্ষার করে তার ক্বাথ করে, এই ক্বাথের সঙ্গে গব্যঘৃত পাক করবে। ত্রিগুণ ত্রিকূট চূর্ণের সঙ্গে এই ঘৃত পান করলে অর্শ রোগে উপকার মেলে।

বিল্বফল দগ্ধ করে তা থেকে সেবনযোগ্য অর্শের ঔষধ পাওয়া যায়। নবনীত ও কৃষ্ণতিল দ্বারাও অর্শের ঔষধ হয়।

জলৌকার ভক্ষিত রক্ত নির্গত করে তা দিয়ে ভগন্দরের লেপনযোগ্য ঔষধ পাওয়া যায়। তবে এই সকল ঔষধ কোনও কোনও প্রকার অর্শের বা ভগন্দরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, রচনাটি সংক্ষেপে রাখার দরুন তা বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা সম্ভবপর হল না।

সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তারজীর পৈতৃক ভিটা

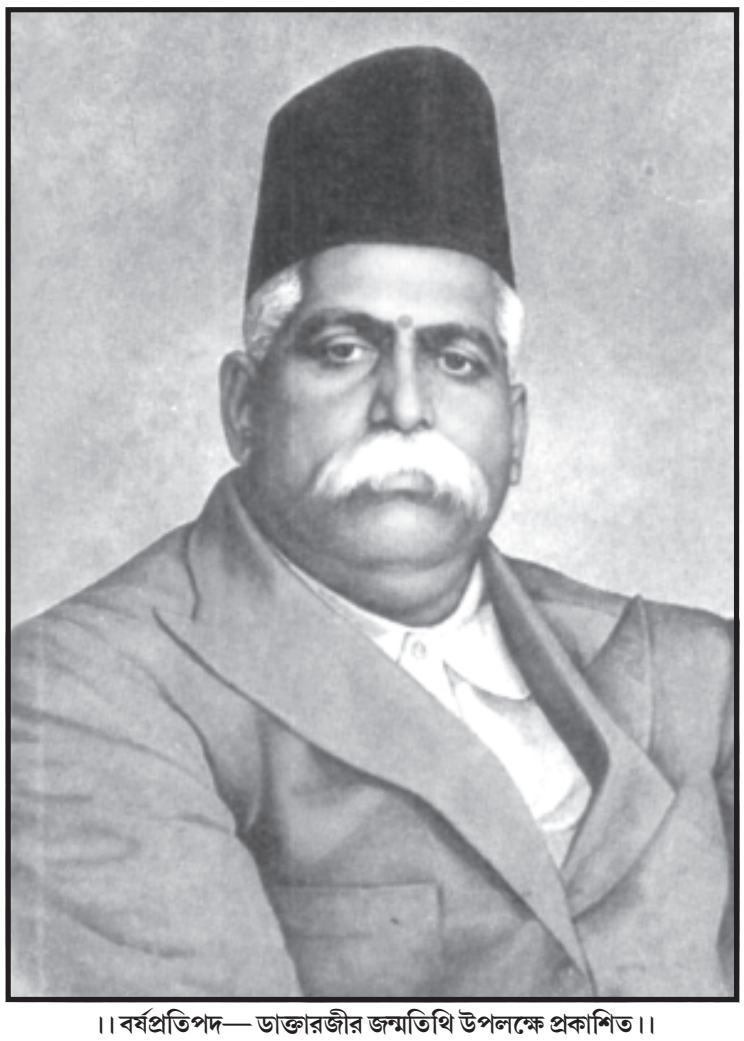

।। বর্ষপ্রতিপদ— ডাক্তারজীর জন্মতিথি উপলক্ষে প্রকাশিত ।।

বিদ্যুৎ মুখার্জী

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মাননীয় সরকার্যবাহ মোহনরাও ভাগবত-এর সঙ্গে প্রবাসের সময় দেশের বিভিন্ন প্রান্তে দর্শনীয় স্থান দেখার ইচ্ছা কমই থাকে, যদিও মোহনজী আগ্রহ করেন এবং স্থানীয় কার্যকর্তাদেরও আগ্রহ থাকে। গতবছর ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে পশ্চিম অন্ধ্রপ্রদেশ প্রান্তের কার্যকর্তা বৈঠক ছিল ভাগ্যনগর (হায়দারবাদ) শহর থেকে প্রায় ৩০০ কিলোমিটার দূরে ইন্দুর (নিজামাবাদ) শহরে। এই শহরকে তেলেঙ্গনা এলাকার রাজধানী বলা যেতে পারে। এখান থেকে মাত্র ৪০-৪৫ কিলোমিটার দূরে 'হেডগেওয়ার' কুলের ভিটা'কন্দকূর্তী' গ্রাম অবস্থিত। লোভ সামলাতে না পেরে, স্থানীয় স্বয়ংসেবক জগমোহনকে নিয়ে বিকালের দিকে পৌঁছলাম বোধন মহকুমাস্থিত কন্দকূর্তী গ্রামে। প্রত্যন্ত গ্রাম। পিচ রাস্তা দিয়ে নিজামাবাদ থেকে দু-চারটি বাস যাতায়াত করে। যাতায়াতের জন্য অবশ্য অটো ইত্যাদি পর্যাপ্ত পাওয়া যায়। ছোট্ট গ্রাম, হিন্দু ও মুসলমান দুই-ই সমান সমান। গোদাবরী নদী তীরবর্তী এই গ্রামের পরিবেশ বেশ সুন্দর। গোদাবরী নদীর অপর পাড়ে মহারাষ্ট্র প্রান্ত। এই নদীই দুই প্রদেশকেআলাদা করেছে। গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে গোদাবরী। 'বহুরা' ও 'হরিদ্রা' নদীর ত্রিবেণী সঙ্গমও এখানে। প্রতি ১২ বৎসর অন্তর এই ত্রিবেণী সঙ্গমে স্থানীয় কুম্ভ খুব প্রসিদ্ধ এবং হাজার হাজার লোক তীর্থস্নান করতে আসে এখানে। নদীর তীরে শিবালয়। শোনা যায় অহল্যাবাঈ হোলকর ৪-৫ কিলোমিটার অন্তর ৪০টি গ্রামে এ ধরনের শিবালয় স্থাপন করেছিলেন। ত্রিবেণী সঙ্গমের মতোই তেলেগু, মারাঠী ও কন্নড় এই তিন ভাষারও সঙ্গম এই এলাকায়। এখানের সমস্ত লোকেরা তিন ভাষাতেই কমবেশি কথা বলতে পারেন যদিও মারাঠী ভাষার চলই বেশি।

'স্কন্ধমাতা' থেকে স্কন্ধমূর্তি --- ভগবান গণেশের এক নাম। এক সময় এই গ্রামে অনেক বিদ্বান ব্রাহ্মণের বসবাস ছিল। তার মধ্যে হেডগেওয়ার ঘরানা অগ্রণী ছিল। বেদ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা ছিল তাদের কুল-পরম্পরা। অগ্নিহোত্র দীক্ষাও নিয়েছিল এই কুল। শংকরাচার্য যখন এই এলাকায় আসতেন, তখন হেডগেওয়ার কুলকেই ধর্মরক্ষার প্রতিনিধি হিসাবে নিযুক্ত করেছিলেন। তখন এই সমস্ত এলাকা ছিল মোগল শাসনের অধীনে এবং হিন্দু ব্রাহ্মণদের ওপর মোগলদের উপেক্ষা ও প্রবঞ্চ না ছিল প্রবল। বিদ্যা, ধর্ম এবং শারীরিক দক্ষতা--এই তিন বৈভবেই ধনী ছিল হেডগেওয়ার পরিবার। ওই বংশের মানুষেরা যেমন ছিলেন ভোজন রসিক, সেরকম গোদাবরী তটে নিয়মিত কুস্তি অভ্যাসেও ছিল পারঙ্গম। শোনা যায়, উঠানে রাখা জোয়ারের ভারী বস্তা বৃষ্টিতে ভিজে যাচ্ছিল। পরিবারের দুই ভাই সহজেই ঘরের মধ্যে উঠিয়ে রেখে ছিল সেই ৪-৫ মণের বস্তায় ভরা ওই জোয়ার।

মোগল শাসনের অত্যাচার, উপেক্ষা ও প্রবঞ্চ না এবং তার ফলে দারিদ্র্যের কারণে প্রায় বেশিরভাগ ব্রাহ্মণ পরিবার তেলেঙ্গানার এই সমস্ত গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র চলে গিয়েছিল। সেই সময় অর্থাৎ প্রায় ২০০ বছর আগে বলরাম পন্থ হেডগেওয়ারের পিতামহ শ্রীনরহরি শাস্ত্রী নিজের পরাক্রমে রাজ্য স্থাপন এবং পরে নাগপুরের ভোঁসলা রাজার অধীনে এসে নিশ্চিন্তে বিদ্যা, পূজার্চনা করা শুরু করেছিলেন। সঙ্ঘের প্রয়াত প্রচারক মাননীয় যাদবরাওজী যোশী আশির দশকে ভূমি দপ্তরে গিয়ে হেডগওয়ার বংশের এই বসতভিটা উদ্ধার করেন এবং শুরু হয় বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প। বিশাল রাম মন্দিরের কাছে ৬-৭ কাঠা জমির ওপর আছে সুন্দর মন্দির (সভাগৃহ) যেখানে কেশবমূর্তি (বিষ্ণু), ভারতমাতা ও কুমারস্বামীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। ৫০-৬০ জন বসার মতো স্থান। পাশেই কেশব স্মৃতি সমিতি এবং তাদের পরিচালিত সরস্বতী বিদ্যামন্দির। ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত চলছে। ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা আড়াই'শ। তার মধ্যে ৮০ জন মুসলমান। সঙ্ঘের তৃতীয় সরসঙ্ঘচালক বালাসাহেবজী এই গ্রামে এসেছিলেন ১৯৯২ সালে। সঙ্ঘের তৃতীয় সরসঙ্ঘচালকরজ্জু ভাইয়া এই মন্দিরের দ্বারোদঘাটন করেছেন ২০০০ সালে। নিয়মিত শাখা চলে গ্রামে। প্রায় ৮০ জন গণবেশধারী স্বয়ংসেবক এই শাখায় আছে। ভবিষ্যতে ১০০ একর জমি কিনে বিভিন্ন ধরনের সেবা প্রকল্প শুরু করার পরিকল্পনা আছে। আগামী দিনে এই গ্রামে স্মৃতি সমিতির মাধ্যমে এলাকার সার্বিক বিকাশের অনেক সম্ভাবনা রয়েছে। সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তারজীর পৈতৃক ভিটার এই গ্রামের মাটি স্পর্শ করে ধন্য মনে হল নিজেকে।

স্মৃতি মন্দিরের প্রবেশপথে চতুর্থ সরসঙ্ঘচালক রাজেন্দ্র সিংহজী (রজ্জু ভাইয়া)।

ডাক্তারজীর পূর্ব পুরুষদের প্রতিষ্ঠিত মন্দির সংস্কারের পর।

ডাক্তারজীর বংশের কুলদেবতা শ্রীকেশব রায়। খননকার্যের সময় প্রাপ্ত।

বিচিত্র খবর বিচিত্র গল্প

নির্মল কর

* বিজ্ঞানীর বলেন, পৃথিবীর পাঁচটি দেশে পাঁচ শ্রেণীর আলাদা আলাদা রঙের মানুষ ছিল। এশিয়ায় হলদে, আফ্রিকায় কালো, ইউরোপে সাদা, অস্ট্রেলিয়ায় বাদামী আর আমেরিকায় তামাটে লাল। এই সম্প্রদায়ের মানুষদের নাম দেওয়া হয়েছে যথাক্রমে মঙ্গোলিয়ান, নিগ্রো, ককেশিয়ান, অস্ট্রালয়েড এবং আমেরিকান ইন্ডিয়ান।

* মরুবক্ষে ফলেছে ভারতের ল্যাংড়া, আলফান্সো, কেশর এবং আরও হরেক কিসিমের আম। অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্যি। বছর চারেক আগে কাতারের উপ-প্রধানমন্ত্রী হামাদ আল আতিয়া দুবাইতে আমের মরুদ্যান গড়ার স্বপ্নে গুজরাত থেকে হাজার তিনেক আমগাছের চারা এনে পুঁতেছিলেন কাতারের রাস লাফ্ফান ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল সিটিতে। এবছর আমের মরসুমে ফলে ভরে গিয়েছে চারা থেকে বৃক্ষ হয়ে ওঠা সেইসব গাছ।

* রাজা রামমোহন রায় রোজ বারো সের করে দুধ খেতেন। তাই বিলেত যাওয়ার সময় ওই দেশে দুধের সমস্যা হতে পারে মনে করে দু'টি দুগ্ধবতী গাভী সঙ্গে নিয়েছিলেন।

* রেলযাত্রার শুরুর দিকে যাত্রীবাহী রেল কামরায় কোনও ছাদ বা আচ্ছাদন থাকত না। রোদ-জলে ভিজে যাতায়াত করতে হত। অনেক সমালোচনা, আবেদন-নিবেদনের পর রেল-কোম্পানী যাত্রীবাহী ট্রেনে ছাদঅলা বগির ব্যবস্থা করে।

* জাপান সম্রাট ওলিন টিন্নো আজীবন রাজা ছিলেন। পৃথিবীর কোনও দেশের রাজা তাঁর মতো এত দীর্ঘকাল রাজত্ব করার সুযোগ পাননি। ওলিন টিন্নোর জন্ম ২০১ সালে। ওই বছরই পিতার মৃত্যু হলে উত্তরাধিকার সূত্রে দোলনায় শুয়েই তিনি রাজসিংহাসন আরোহণ করেন। ৩১০ সালে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত ১০৯ বছর তিনি জাপান শাসন করে গেছেন।

* আজকের মতো সেকালেও নানা উপলক্ষে হালফ্যাশনের শাড়ি বেরত। সিপাহী বিদ্রোহের পর গান লেখা সিপাই-পেড়ে শাড়িতে বিদ্যাসাগরের নাম উঠেছিল বিধবা বিবাহ প্রচলন হওয়ার পর। অবশ্য ওইসব শাড়ির পাড়ে বিদ্যাসাগরের নিন্দা প্রশংসা দুই-ই লেখা হয়েছিল।

* কম্বোডিয়ার দম্পতি মাইয়ুন রিম আর নামরিম নিত্য দাম্পত্য-কলহে জেরবার হয়ে ঠিক করলেন, অনেক হয়েছে আর নয়। কিন্তু এরপর যা ঘটল, সেটা অভিনয়। বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলায় হ্যাপা অনেক, খরচও কম নয়, সময়ও লাগে অনেক। দম্পতি কাঠের বাড়িটাকে করাত দিয়ে দু'ভাগ করে ফেললেন, ঘরে যা ছিল ভাগ করে নিলেন; জমিজমাও চার ভাগ হল---দু'ভাগ নিজেদের, আর দু'ভাগ দুই সন্তানের। উকিলরা বলেছেন, ভাগাভাগি ওঁরা করতেই পারেন, তার আইনসম্মত ডিভোর্স তো হল না! উকিলরা স্বভাবতই ক্ষুব্ধ।

সাচার রিপোর্ট যেন মুসলিম তোষণের হাতিয়ার

অজিত ভকত

ভারতবর্ষে সংখ্যালঘু তোষণ আগেও ছিল আজও আছে। কিন্তু বিচারপতি রাজেন্দ্র সাচারের রিপোর্ট পেশ হওয়ার পর থেকে তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ নেতা-নেত্রী ও রাজনৈতিক দলগুলো যেন মুসলিম তোষণের প্রতিযোগিতায় নেমেছে। সব কাজ শিকেয় তুলে তাদের এই দৌড়ে সামিল হওয়া চোখে পড়ার মতো। সাচার রিপোর্ট যেন এইসব নেতা ও রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে উন্নয়ণের নামে খোলাখুলি মুসলিম তোষণের 'হাতিয়ার' হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমাদের দেশে বিভিন্ন বিষয় দেখভালের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রক রয়েছে, দপ্তর রয়েছে, তাতে রয়েছেন গণ্ডায় গণ্ডায় মন্ত্রী ও আমলাকুল। তা সত্ত্বেও শুধুমাত্র সংখ্যালঘুদের উন্নয়ণ দেখভালের জন্য পৃথক সংখ্যালঘু দপ্তর, সংখ্যালঘু সেল খোলা হচ্ছে। নিয়োগ করা হচ্ছে সংখ্যালঘু অফিসার। ঘোষিত হচ্ছে নতুন নতুন প্যাকেজ। মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় স্কুল-কলেজ, হাসপাতালের শিলান্যাস করার ধুম পড়েছে। প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরি জ্বালানো হচ্ছে। এসব দেখেশুনে স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠছে, শিক্ষা দপ্তর, স্বাস্থ্য দপ্তরসহ অন্যান্য দপ্তরগুলো কি তাহলে তাদের দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন করেনি বা করছে না? এজন্যই কী সংখ্যালঘু উন্নয়ণ দেখভালের জন্য আবার নতুন দপ্তর খুলতে হচ্ছে? দপ্তরগুলো ঠিকঠাক কাজ না করার ফলে যদি সংখ্যালঘু উন্নয়ণ ব্যাহত হয়ে থাকে, তাহলে একই কারণে সংখ্যাগুরু সমাজও তো প্রকৃত উন্নয়ণ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। এক্ষেত্রে কি তবে তাদের জন্যও আলাদা দপ্তর খোলা হবে? নাকি উন্নয়ণের নামে সংখ্যালঘুদের জন্য আলাদা দপ্তর খুলে, মুসলিম তুষ্টিকরণের মাধ্যমে মোক্ষপ্রাপ্তিই এর আসল উদ্দেশ্য?

উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, এর ফলে সরকারি ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম সম্প্রদায়ের সঙ্গেও সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজের ব্যবধান ক্রমশ বাড়ছে বৈ কমছে না। এই বিভেদমূলক সরকারি নীতিই পারস্পরিক অবিশ্বাস ও বৈষম্য সৃষ্টির সহায়ক হিসেবে কাজ করছে।

বিচারপতি রাজেন্দ্র সাচার রিপোর্টের মূল বক্তব্য, ভারতীয় মুসলিম সম্প্রদায় এদেশে চূড়ান্ত সামাজিক বৈষম্যের শিকার এবং এ কারণে পশ্চাদপদ। তাদের জন্য পৃথক দপ্তর খোলা বা সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু করাই যে এর থেকে মুক্তির পথ, একথা কিন্তু সাচার কমিটির রিপোর্টে বলা হয়নি। বরং কেবল প্রশাসনিক ও রাষ্ট্রিক প্রয়াসে কোনও সম্প্রদায়ের প্রান্তিকতা বা বৈষম্য যে দূর হওয়া সম্ভব নয়, একথা রিপোর্টে স্বীকার করা হয়েছে। লক্ষ্ণীয়ভাবে সাচার রিপোর্টে জোর দেওয়া হয়েছে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের ওপর। সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির

> **"সরকার পক্ষ ভোট-ব্যাঙ্কের হিসেব কষে উদ্বাহু হয়ে ঘোষণা করছে— 'ভারতের সম্পদে প্রথম অধিকার মুসলিমদের'। আর মুসলিম সমাজ সাচার রিপোর্টকে সামনে রেখে নিজেদের পাওনাগণ্ডা বুঝে নিতে যতটা সক্রিয়, রাষ্ট্রের সাথে, রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজের সঙ্গে সৌহার্দ্য স্থাপনে তারা ততটাই উদাসীন।"**

পরিবর্তন না ঘটলে এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যে সম্ভব নয় তাও পরোক্ষভাবে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে রিপোর্টে। এর অর্থ, সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজকে সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি সামাজিক বৈষম্য নিরসনে আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হওয়া। যদিও সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজের সকলেই যে শিক্ষা-দীক্ষা, অর্থে উন্নত একথা বলা চলে না। সেটা অন্য প্রসঙ্গ। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজ সংখ্যালঘু মুসলিমদের প্রতি বৈষম্যের মানসিকতা পোষণ করে কিনা, যদি করে তবে তার কারণ নির্ণয় এবং তা নিরসনে না সরকার, না মুসলিম সমাজ— কেউই আগ্রহী নয়। বরং সরকার পক্ষ ভোট-ব্যাঙ্কের হিসেব কষে উদ্বাহু হয়ে ঘোষণা করছে— 'ভারতের সম্পদে প্রথম অধিকার মুসলিমদের'। আর মুসলিম সমাজ সাচার রিপোর্টকে সামনে রেখে নিজেদের পাওনাগণ্ডা বুঝে নিতে যতটা সক্রিয়, রাষ্ট্রের সাথে, রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজের সঙ্গে সৌহার্দ্য স্থাপনে তারা ততটাই উদাসীন। স্বাভাবিকভাবে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়ায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজের মানসিকতায় যদি মুসলিম সমাজের প্রতি কণামাত্রও বৈষম্য সৃষ্টি হয়ে থাকে, তবে তার দায় মুসলিমরা অস্বীকার করতে পারেন না। কিছু পেতে গেলে কিছু দিতে হয়— এটাই নিয়ম। তাই সবার আগে এ দেশকে স্বদেশ, মাতৃভূমি এবং এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজকে ভ্রাতৃ-জ্ঞানে আপন করে নেওয়ার মানসিক উদারতা দেখাতে হবে, সংকীর্ণ ধর্মীয় মোড়ক ছেড়ে বেরিয়ে আসতে হবে মুসলিম সম্প্রদায়কে।

মুসলমান মানে ধর্মীয় গোঁড়ামি, মাদ্রাসা, ওয়াকফ, একাধিক বিয়ে, তালাক। সন্ত্রাসবাদী মানেই মুসলমান— মুসলিম সমাজকে ঘিরে এই যে ধারণার বাতাবরণ গড়ে উঠেছে তা ভাঙতে হবে মুসলিমদেরই। অ-মুসলিম মানেই কাফের, যেন-তেন প্রকারে তাদের হত্যা করা, বিরোধিতা করা, তাদের ভাবাবেগ, ধর্মীয় বিশ্বাসে আঘাত করা, যে রাষ্ট্রে বাস করছি, যে রাষ্ট্রের জল-বায়ু-অন্ন গ্রহণ করে বাঁচা, সেই রাষ্ট্রের বিরোধিতা করা, সেই রাষ্ট্রের গণতন্ত্র, বিচারব্যবস্থাকে অস্বীকার করা, তাচ্ছিল্য করা— মুসলিম সমাজের একাংশ এই মানসিকতা থেকে বেরিয়ে যতদিন না রাষ্ট্রের প্রতি তাদের দায়বদ্ধতা, রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজের প্রতি তাদের কর্তব্য বুঝবেন, ততদিন সংখ্যালঘু অনুন্নয়ণ এবং পশ্চাদপদ নামক ব্যাধি সারানো কোনও কমিশনের পক্ষেই সম্ভব হবে না। যেমন শুধু ওপর থেকে মলম লাগিয়ে পচন ঠেকানো সম্ভব হয় না।

ধর্মের দোহাই দিয়ে 'পালস্ পোলিও টিকাকরণ' ও 'জন্মনিয়ন্ত্রণ'-এর মতো জনকল্যাণকারী প্রকল্পের বিরোধিতা করা যে কোনও সুস্থ সচেতন সমাজের পক্ষে বেমানান। সঙ্কীর্ণ ধর্মীয় জিগির তুলে অন্য ধর্মের আচার-অনুষ্ঠান, শোভাযাত্রায় বাধাদান অসহিষ্ণুতারই বহিঃপ্রকাশ। এসব অসামাজিক কাজের সক্রিয় বিরোধিতা করে, সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে উন্নত ও শক্তিশালী ভারত গঠনের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে প্রকৃত সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি। তবেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বেদনায় সংখ্যাগুরু সমাজও হয়ে উঠবে সমব্যাথী। এভাবেই সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের পথ প্রশস্ত হবে, অপসারিত হবে সামাজিক বৈষম্যর কালো ছায়া।

মুসলমানদের শিক্ষার উন্নতি ও সম্প্রসারণের পথেও অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে মুসলিম সমাজেরই একাংশের ধর্মীয় গোঁড়ামী। উপযুক্ত শিক্ষা ছাড়া কোনও জাতি, সম্প্রদায়, সমাজ অগ্রসর হতে পারে

বিচারপতি রাজেন্দ্র সাচার

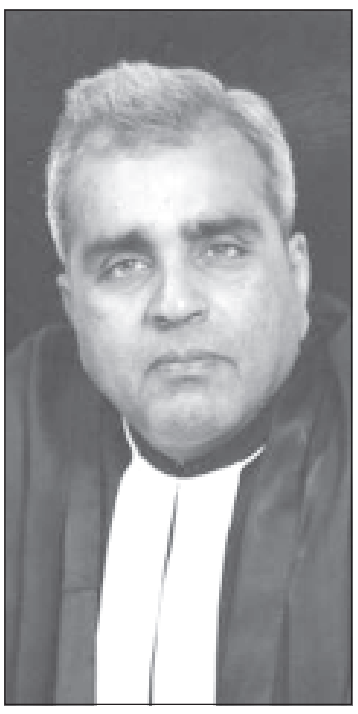

না। 'সমান সুযোগ' পাওয়ার জন্য সমান যোগ্যতাও অর্জন করতে হয়। যোগ্যতার অভাবই যদি সংখ্যালঘুদের আর্থিক, সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়ার হেতু হয়, তবে সেই যোগ্যতামান অর্জনের প্রথম এবং প্রধান পদক্ষেপই হচ্ছে উপযুক্ত শিক্ষা। পাছে ইসলামের যাবতীয় জ্ঞানকে অনুন্নত বলে সরিয়ে রাখা হয়— এই ধারণার বশবর্তী হয়ে আধুনিক শিক্ষার পরিবর্তে আঁকড়ে ধরে রাখার চেষ্টা হচ্ছে মাদ্রাসা শিক্ষাকে। আর 'মাদ্রাসা' নামটিকে ইসলাম সেন্টিমেন্টের সঙ্গে জড়িয়ে দিয়ে স্বার্থান্বেষী নেতারাও মাদ্রাসা আধুনিকীকরণের নামে মুসলিম ভোট পেতে আগ্রহী। এভাবেই গত ৩০ বছরে রাজ্যে যেমন নতুন নতুন মাদ্রাসা স্বীকৃতি পেয়েছে, তেমনি এই খাতে ব্যায়বরাদ্দও বাড়ানো হয়েছে দেড়'শ গুণেরও বেশি। ১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল ২৩৮টি। আর ২০০৬ সালে সেটা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫০৮টিতে। ১৯৭৬-৭৭ সালে যেখানে মাদ্রাসা শিক্ষাখাতে বরাদ্দ ছিল মাত্র ৫৮ লক্ষ টাকা, সেখানে ২০০৫-০৬ সালে হয়েছে ১৮৮.২০ কোটি টাকা। এই বিপুল ব্যয়বরাদ্দ সত্ত্বেও অবস্থার কিন্তু তেমন হেরফের হয়নি। সাচার কমিটির রিপোর্টেই মুসলিমদের বৃহদংশের অশিক্ষার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব ওই রিপোর্টেই প্রমাণিত হচ্ছে, মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকীকরণের মাধ্যমে মুসলিমদের শিক্ষাগত উন্নতিতে সরকারের চরম ব্যর্থতা।

শিক্ষার মূল স্রোতে ফিরে না এলে সমাজের মূল স্রোতে, কর্মক্ষেত্রের মূল স্রোতে আসা সম্ভব নয়— এই বাস্তব সত্যটা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে উপলব্ধি করতে হবে। একমাত্র মাদ্রাসা শিক্ষার মাধ্যমেই ইসলামের ঐতিহ্য টিকে থাকবে— এই ধারণা ত্যাগ করে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের মাধ্যমে বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা গ্রহণের দাবিকে জোরদার করতে হবে মুসলিম সমাজকেই। মাদ্রাসাকেন্দ্রিক রাজনীতি বন্ধ করে প্রত্যেকটি মুসলমানের জন্য অভিন্ন শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে আধুনিক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ করে দেওয়ার দাবি তুলতে হবে। আর সমগ্র মুসলিম সমাজকে এবিষয়ে উদ্বুদ্ধ করার দায়িত্ব নিতে হবে ওই সমাজেরই শীর্ষস্থানীয় মানুষজন ও ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গকে।

ধর্মীয় কারণে অভিন্ন দেওয়ানি বিধির বিরোধিতা করে দেশে সমান্তরাল বিচার ব্যবস্থা চালু রেখে মুসলিম সমাজ কতটা লাভবান হয়েছে সেটা বিচার্য বিষয়। কিন্তু একই সরকারের তত্ত্বাবধানে চলা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ও মাদ্রাসা বোর্ড-এর মতো সমান্তরাল শিক্ষা ব্যবস্থাকে সমর্থন করলে মুসলিম সমাজের একাংশকে চিরদিনের জন্য 'মুসলমান' করে রাখা যাবে, কিন্তু তাদের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনা যাবে না।

গত ১০ মার্চ বর্ধমান জেলার ঘড়ি গণ্ডী নদীর ধারে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রখ্যাত আবৃত্তিকার প্রদীপ ঘোষের আবৃত্তি সিডি-র উদ্বোধন হল। কবি রণদীপ দাসের কাব্যগ্রন্থ 'ঘুমের ভিতরে কোন এক পাখি উঠেছিল' অবলম্বনে 'চোদ্দ মাইল ছুটে' নামক সিডি-র উদ্বোধন করেন বিখ্যাত চিত্রকার প্রকাশ কর্মকার। কবি রণদীপ দাস তাঁর স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করে শোনান। এই উপলে(এদিন এক চিত্র প্রদর্শনীও হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন 'আলোবাতাস' পত্রিকার সম্পাদক স্বপ্নকমল সরকার।

বছরে একটা টুর্নামেন্ট

ভারতীয় ফুটবল এগোবে কি করে?

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

সবেধন নীলমণি ওই বছরে একবার নেহরুকাপ টুর্নামেন্ট কিংবা এ এফ সি কাপ। ৫-৬টা ম্যাচ। এছাড়া পর্তুগাল কিংবা হংকং সফরে গিয়ে দ্বিতীয়, তৃতীয় শ্রেণীর ক্লাব দলের বিরুদ্ধে প্রীতি ম্যাচ। এরকম ম্যাচ এক্সপোজার নিয়ে ভারতীয় ফুটবল কি করে এশিয় ফুটবলের মূল স্রোতে ফিরে আসবে আর সেই ফিরে আসার স্বপ্ন বাতাসে ভাসিয়ে দেন বব হাউটন ও আলবার্তো কোলায়েস। সারা দেশের লাখো-লাখো যথার্থ ফুটবল প্রেমীকে এভাবেই বোকা বানিয়ে রেখেছেন তারা।

প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী মৃত্যুশয্যায়। যে কোনও মুহূর্তে তাঁর মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করবেন সোনিয়া গান্ধী---মনমোহন সিংহ, ভারতীয় ফুটবলে কুড়ি বছরের প্রশাসনে প্রিয়রঞ্জন অবশ্য শেষ পর্বে এসে কিছু কাজ করেছিলেন। যেমন জি-স্পোর্টস এবং ও. এন. জি. সি-কে ভারতীয় ফুটবলের সঙ্গে যুক্ত করা ও আর্থিক স্বাচ্ছন্দের ব্যবস্থা করা। দিল্লীতে ফুটবল হাউস তৈরি করা, যেখান থেকে সর্বভারতীয় ফুটবল পরিচালনা হচ্ছে বর্তমানে। ফিফার ডেভলপমেন্ট প্রোগ্রামের আওতায় ভারতীয় ফুটবলকে নিয়ে আসা। যে কারণে ফিফার 'ভিসন এশিয়া' প্রকল্পে গুরুত্ব পাচ্ছে ভারতীয় ফুটবল। কিন্তু

এসব করেও জাতীয় দলের জন্য যদি পর্যাপ্ত আন্তর্জাতিক ম্যাচের ব্যবস্থা না করা যায় তবে ভারতীয় ফুটবলের অগ্রগতিই আটকে থাকে। একটা নির্দিষ্ট বৃত্তের বাইরে বেরোতে পারে না।

পর-পর দু-বছর দুটো মাঝারী মানের আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট জেতার সুবাদে ভারতীয় ফুটবলকে ঘিরে যে আগ্রহের বাতাবরণটা তৈরি হয়েছিল, তা কাজে লাগাতে ব্যর্থ ফেডারেশন। এশিয় স্তরে নানা দেশ থেকে আমন্ত্রণী টুর্নামেন্ট খেলতে ভারতকে আমন্ত্রণ জানান সত্ত্বেও ফেডারেসন টিম পাঠায়নি। আগে ভারত মারডেকা কিংসকাপ, প্রেসিডেন্ট গোল্ড কাপ--এধরনের নানা টুর্নামেন্ট খেলতে যেত। তাই এশিয়ান গেমসে তখন ভারত কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যন্ত উঠতে পেরেছিল। এখন এশিয়ার্ড, প্রি-ওয়াল্ড কাপ, প্রি-অলিম্পিকে গ্রুপ লিগ থেকেই বিদায় নিতে হয়। তার জন্য ফুটবলারদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। কোরিয়া, জাপান, ইরান, ইরাক, কাতার, চীনসহ এশিয় ফুটবলে প্রথম শ্রেণীর শক্তিধর দলগুলোর মোকাবিলা করার সুযোগই পায় না ভারত। তাহলে আমাদের ফুটবলাররা তাদের টেক্কা দেওয়ার আত্মপ্রত্যয়, টেকনিক, স্কিল, স্ট্র্যাটেজি আরও করবে কীভাবে?

এ এফ সি কাপ, নেহরুকাপে কাজাখস্থান, তুর্কমেনিস্থান, সিরিয়া, উত্তর কোরিয়া, মায়ানমার, তাজিকিস্থানের মতো প্রায় সমমানের কিংবা সামান্য এগিয়ে থাকা দলের বিরুদ্ধে খেলে টুর্নামেন্ট জেতা এক কথা আর হোভিওয়েট এশিয় দলগুলির মোকাবিলা করে এশিয়ান গেমস, প্রি-অলিম্পিকে ভালো পারফরমেন্স করা অন্য ব্যাপার। তারজন্য ওইসব দেশের বিরুদ্ধে নিয়মিত খেলা দরকার। দরকার মাঝেমধ্যে ইউরোপের কোনও দেশে গিয়ে ট্রেনিং করা, প্রস্তুতি ম্যাচ খেলা ভালো মানের ক্লাব দলের সঙ্গে।

ক্রিকেটাররা বছরে এত ম্যাচ খেলে বলে অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারতের কাছে অপরাজেয় নয়। আগে হকি টিমও বছরে ১৫-২০টার মতো আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলত। এখন জাতীয় হকি দলও তুলনায় অনেক কম ম্যাচ খেলছে। তাই অলিম্পিকের মূলপর্বে

খেলার যোগ্যতা পায় না। এশিয়ান গেমসে ব্রোঞ্জও জোটে না। দেশের দুটি প্রধান আমজনতার খেলাকে অপাংক্তেয় করে রাখা হয়েছে। জাতীয় ফুটবল লীগ নিয়ে এত মাতামাতি অথচ জাতীয় দল বছরে কটা ম্যাচ খেলল, ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে কতটা উঠে এল ভারত, এশিয়স্তরে আমাদের ফুটবলকে ঠিক কতখানি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে---এসব ব্যাপার নিয়ে কোনও হেলদোল নেই ফেডারেশন কর্তা থেকে মিডিয়া, কারুরই।

আন্তর্জাতিক স্তরে জাতীয় দলের ঠিকভাবে মূল্যায়ন না হলে যে আই লীগ, ঘরোয়া ফুটবলের কোনও গুরুত্ব থাকে না, এ বোধটা কবে আসবে তাদের?

ঘুরে দাঁড়াচ্ছে অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট

নিজস্ব প্রতিনিধি।। অস্ট্রেলিয়া যেন খোঁচা খাওয়া বাঘ। রক্তাক্ত, আহত বাঘ যেমন করে আক্রমণাত্মক হয়ে উঠে, যাকে সামনে পায় আঁচড়ে, কামড়ে ক্ষত-বিক্ষত

করে ছাড়ে, তেমনি হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার দশা অস্ট্রেলিয়ার সামনে। ২০০৮-র ডিসেম্বরে যে দক্ষিণ আফ্রিকা অস্ট্রেলিয়াকে তাদের ঘরের মাঠে হারিয়ে ক্রিকেট-বিশ্বে সোরগোল ফেলে দিয়েছিল, যে দক্ষিণ আফ্রিকা ঘরের মাঠে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে টেস্ট ক্রিকেট একনম্বর দল হিসেবে স্বীকৃতি পেতে একটু বেশিই আত্মবিশ্বাসী হয়ে পড়েছিল। কিন্তু ছবিটা বদলে গেল একসময়। ভাঙাচোরা অস্ট্রেলিয়া দল দক্ষিণ আফ্রিকায় খেলতে এসে চিরকালীন ব্যাগি গ্রীণ টুপির মর্যাদা ধরে রাখার পাশাপাশি দক্ষিণ আফ্রিকার মনোবলকে তুবড়ে দিয়ে গেল--জাঁতাকলে পিষ্ট করার মতো।

একবার ভাবুন তো, বছর কয়েক আগের অস্ট্রেলিয়া দলটার কথা। প্রত্যেকটা পজিশন চ্যাম্পিয়ন ক্রিকেটারে ঠাসা। ওপেনিং ব্যাটিং জুটিতে ম্যাথু হেডেন, জাস্টিন ল্যাঙ্গার। মিডল অর্ডারে রিকি পন্টিং, ড্যানিয়েল মার্টিন, মাইকেল ক্লার্ক, লোয়ার অর্ডারে অ্যাডাম গিলকিস্ট্র, যিনি কিনা ব্যাটসম্যান হিসেবেই যে কোনও দলে ঢুকে পড়তে পারেন। আর তিন পেসার---গ্লেন ম্যাকগ্রাথ, জেসন গিলেসপি, ব্রেট লি'র সঙ্গে মাস্টার স্পিনার শেন ওয়ার্ন। এহেন একটা টিম টানা চার বছর দেশ-বিদেশে ছড়ি ঘুরিয়ে আসার পর হঠাৎই অন্ধকার সুড়ঙ্গের মুখে এসে দাঁড়াল। একে-একে অবসর নিয়ে ফেললেন বেশ কয়েকজন ক্রিকেটার।

সেই টিম যখন একটা পরিবর্তনহীন অবস্থার মধ্যে দিয়ে যায়, ভারতে এসে সিরিজ খোয়ায়। দেশে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে হারে। মিডিয়ার সমালোচনায় জর্জরিত টিমের প্রতিটি সদস্য এবং অধিনায়ক রিকি পন্টিং একেক সময় ভেঙে পড়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেন অবসর নিয়ে ফেলবেন কিনা? কিন্তু আজ অধিনায়ক, ব্যাগি গ্রিন টুপির মর্যাদার ধারক ও বাহক রিকি পন্টিং অন্য ধাতুতে গড়া মানুষ। লড়াই ছেড়ে রণক্ষেত্র থেকে পালাবার বান্দা তিনি নন। সিনিয়র একখানা ক্রিকেটার অবসর নিয়ে ফেলেছেন। দলে নেই ভারসাম্য রক্ষাকারী অলরাউন্ডার অ্যান্ড্রু সাইমন্ডস। অভিজ্ঞ খেলোয়াড় বলতে সাইমন কার্টিচ, মাইকেল ক্লার্ক, আর তিনি নিজে। মাইকেল জনসনকেও অভিজ্ঞ বলা চলে না। ব্রেট লি'র অনুপস্থিতিতে অবশ্য দলের পেস বোলিং বিভাগের নেতা তিনিই। নামে অনভিজ্ঞ দু-তিনজন সীমার নিয়ে এহেন জনসনই দক্ষিণ আফ্রিকার বিখ্যাত ব্যাটিং লাইনকে দুমড়ে-মুচড়ে মাটিতে শুইয়ে দেন।

ম্যাথু হেডেনের স্থলাভিষিক্ত ফিলিপ হিউজ কী অসাধারণ ব্যাটিংটাই না করলেন। বিপক্ষে বিশ্বের সেরা পেস অ্যাটাক। স্টেইন, এনতিনি, মর্কেল, মালিসদের ক্লাব পর্যায়ের বোলারে নামিয়ে এনে দু-ইনিংসেই শতরান করে ফেলেন জীবনের দ্বিতীয় টেস্টেই। অধিনায়ক পন্টিং প্রতিটি টেস্টেই ব্যাট হাতে কষ্টকর ভূমিকা নিচ্ছেন। তাকে যে যথার্থ কাণ্ডারির ভূমিকা পালন করতে হবে। ক্লার্ক সেভাবে নিজেকে মেলে ধরতে পারছেন না। অভিজ্ঞ ব্যাটসম্যান তথা অধিনায়ক হিসেবে পন্টিংকে যে গাইড করে নিয়ে যেতে হবে তরুণ হিউজ, মার্কস নর্থকে। নিজেকেও রান করতে হবে, বড় পার্টনারশিপ গড়ে তুলতে হবে তরুণ, অনভিজ্ঞ ব্যাটসম্যানদের সঙ্গে। তাহলে তাদের আত্মপ্রত্যয়ও বেড়ে যাবে। ভবিষ্যতে এরাই যে অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটিংয়ের নিউক্লিয়াস। একেবারে সামনে থেকে দাঁড়িয়ে নেতৃত্ব দেওয়ার পাশাপাশি পন্টিং নিজে রান করে, অন্য ব্যাটসম্যানদের কাছ থেকে সেরা খেলা বের করে আনতে পেরেছেন। এটাই প্রকৃত অস্ট্রেলিয়ানইজম।।

শব্দরূপ - ৫০১

অনুপ মজুমদার

১			২	৩	■	৪	৫
■	■	■	৬				
৭	■	■		■	■	■	
	■	৮		■	৯		
১০			■	১১		■	
	■	■	■		■	■	
১২	১৩		১৪		■	■	■
১৫		■	১৬				

সূত্র ঃ

পাশাপাশি ঃ ১. দেবী দুর্গার নিধনকারী অসুর-বিশেষ, ৪. শরতের ফুল ৬. রাজার ছেলে, ৮. নশ্বর, ৯. বিশেষণে বড়ো, প্রতিশব্দে উদার, মহান, ১০. রান্নার এক উপাদান, প্রথম দুয়ে রাম তনয়, ১১. অব্যয়ে পরে পশ্চাৎ সাদৃশ্য যোগ্যতা ইত্যাদি সূচক উপসর্গ, ১২. অন্য নামে সীতাদেবী, প্রথম তিনে পৃথিবী, শেষ দুয়ে সূত্র, ১৫. প্রণাম, ১৬. বিশেষণে উপলব্ধি বা অনুমান করা অসাধ্য এমন।

উপর-নীচ ঃ ২. প্রতি শব্দে ইস্ট, যামির, প্রথম দুয়ে মদ্য, শেষ দুয়ে নির্যাস, ৩. একই শব্দে ধুলো, পুষ্পরেণু, ৪. অল্প বিরতি ... চিহ্ন ৫. শরতের ধর্মীয় অনুষ্ঠান, দুয়ে - পাঁচে নির্যাস, ৭. শ্রীরামচন্দ্র অসময়ে দেবী দুর্গার আরাধনা করেন তাই এই পূজাকে যা বলা হয়, ৮. ওজন বিশেষ ৯. ব্রহ্মার চতুর্দশ পুত্রের অন্যতম মনুষ্যজাতির আদি পুরুষ, ১১. জীব দেহধারী দেবতা, ১৩. কন্দর্প, বিশেষণে আনন্দজনক, ১৪. প্রতিশব্দে অমৃত।

সমাধান শব্দরূপ ৪৯৯

সঠিক উত্তরদাতা

বীরেন্দ্র নাথ মাইতি
তমলুক, পূর্ব মেদিনীপুর।

মে	■	■	না	মা	ব	লি	■
ন	■	■	ছো	■	ল্ল	■	■
কা	ঠ	খ	ড়	■	ব	ল	ভি
■	ন	■	■	■	■	ব	■
■	ঠ	■	■	■	■	কু	■
ব	নে	দি	■	প	রা	শ	র
■	■	দি	■	শ	■	■	য়া
■	ঝ	মা	ঝ	ম	■	■	নী

● এই সংখ্যার সমাধান আগামী ৬ এপ্রিল ২০০৯ সংখ্যায়।

গান ধরেছেন উন্নয়ণেশ্বর পোঁ ধরেছেন নন্দীশ্বর আর ভৃঙ্গীশ্বর

বিশাখা বিশ্বাস

'পাটিগণিতে দুই-য়ে দুই-য়ে চার হয়, আবার শূন্যও হয়'।....

আহারে। রসিক সুজনের বক্ষ গর্ভের অতল রসসাগর হতে উঠে আসা রসিকতার কী রূপমাধুরি রে। বুটের তলায় আর বন্দুকের বেয়নেটে থেঁতলে যাওয়া শ্যামলী-সিঙ্গুর আর নন্দীগ্রামের চেয়ে গণরোষে অধিকতর চ্যাপ্টা হয়ে যাওয়া বিষ্ণুপুরের লালদুর্গের স্তূপপাদমূলে দাঁড়িয়ে যেন সাবেকী সেই যাত্রাপালার গান ধরার আগে সেই সব উদাসী বিবেকের বিলাপ ঃ দুই-য়ে দুই-য়ে চার হয়, আবার শূন্যও হয় (ওরে, এই তো ভবের খেলারে...)। উন্নয়ণেশ্বর জাগলে, জেগে উঠে গাইলে, উন্নয়ণনশ্বরের সঙ্গী-সাথী সব গোত্রের নন্দীশ্বর ভৃঙ্গীশ্বরদেরও গাইতেই হয়। অতএব, খুনের দায়ে জেল খাটা কয়েদীকেও তাই গাইতে হল "ভুল করে মানুষ বিষও খায়"।

তা সত্যি। ভুল করে মানুষ বিষ তো খায়ই। সাতাত্তরের নির্বাচনী সাগর মন্থনে অমৃত উঠেছিল, বিষও উঠেছিল। অমৃতভান্ড নিয়ে গেল টাটা-বিড়লা জৈন গোয়েঙ্কার গোলাম লালাবাদীরা, পড়ে থাকা বিষের পানপাত্রে ভুল করে চুমুক দিয়ে ফেললো বাংলার মানুষ। লালবাবু নামক পরমাত্মাদের ডাকে যোগীদের মতো, ব্রহ্মের ডাকে বৈদান্তিকের মতো, পরমপুরুষ কৃষ্ণের ডাকে বোষ্টমদের মতো, ব্রহ্মময়ীর ডাকে শাক্তদের মতো, রুদ্রেশ্বরীর মহাকালের ডাকে শৈবদের মতো 'ভুল করে'-ই হয়তো সেই লাল-বিষ সেদিন পান করে ফেলেছিল পশ্চিম বাংলা।

তারপর সেই বিষের জ্বালায় আজও জ্বলছে এই রাজ্য। সারা রাজ্য জুড়ে দুর্নীতি আর দুর্বৃত্তায়নের অধর সংগমে তীর্থযাত্রা করেছে লালবাদী সরকার। 'মাতৃভাষার মাতৃদুগ্ধ' পান করিয়ে শিক্ষাক্ষেত্রের চারদিকে আনা হয়েছে ঘনায়িত অন্ধকার, ভবিষ্যতের নির্জন নিশা ("ছেলে-মেয়েরা ইংরেজী স্কুলে পড়ে, বাংলাটা তাই ঠিক বোঝে না"- এই তথ্য বিজ্ঞাপিত করে

> **"সদ্য গোঁফ-গজানো ছেলেদের প্রতি ঘন্টায় একটি কবিতা লেখার মতো এখন এরাজ্যে ঘন্টায় ঘন্টায় শিলান্যাসের সময়। শব্জীতে বিষ, মিঠাইতে বিষ, মদে বিষ, ঔষধে বিষ, নন্দীশ্বর -ভৃঙ্গীশ্বর উন্নয়ণেশ্বরদের কথাতেও বিষ — সত্যি, "মানুষ ভুল করেও বিষ খায়" — দীর্ঘ বত্রিশ বছর আগে 'ভুল' করেই বিষ খেয়ে ফেলেছিল মানুষ, ইনসাল্লা।"**

চীৎকার করে ওঠেন, এ হল এক আত্মহত্যাকারীর লাস। হাসপাতাল চত্বরে দশ টাকায় সদ্যজাত শিশু টিকা হয়, এক ভাঁড় দেশী মদের দাম এগারো টাকা, এক লিটার পেপসি আঠারো টাকা (রাজপথে মন্ত্রীর গাড়িতে সাইরেন — রাজ্যটা মার্ক্সবাদীদের)! প্রায় তিন যুগের সুশাসনের বঞ্চ নায়-বেদনায় পাহাড় শব্দহীন, বত্রিশ বছর পরে পাহাড়িয়া, পাথুরিয়া মানুষের

গর্বিত হন মন্ত্রী থেকে পঞ্চায়েত প্রধান)। হাসপাতালে ঔষধ নাই, পথ্য নাই, ডাক্তার নাই, প্রসূতির সদ্যজাত শিশুকে খুবলে খায় কুকুর। চা-বাগানের কর্মচ্যুত শ্রমিকের সঙ্গী-অনাহার, আমলাশোল আর জলঙ্গির পর খোদ বারাসাতেও মানুষ বুভুক্ষায় হচ্ছে স্থাপত্য। ফসলের ক্ষেত্রে দেনার নোটিশ গলায় ঝুলিয়ে মৃত দেহ পড়ে থাকে জীবন্ত মানুষের মতো। রেলের লাইনে শব পেলেই আইপিএস বাবুরা

হাতে প্রতারণার বিরুদ্ধে প্রতিস্পর্ধী গান্ডীব (তীর-ধনুক)। টিভি-র পর্দায় অর্ধনগ্ন কুমারীর শরীরি বিজ্ঞপ্তি — সরকারের আকাশবার্তায়, আর সেবাদাস 'ঘন্টামিডিয়ায়' নগ্নবক্ষ নারীর রমণীয় বিজ্ঞাপনে বিচ্ছুরিত মার্ক্সবাদী-সংস্কৃতির কলরব। শহীদ মিনারে মার্চপাস্ট — শিল্প আর কৃষির সমন্বয়ে উন্নয়ণের সপ্তাশ্ব রথে চেপে 'সাংস্কৃতিক নটবর' গণ বত্রিশটি বছর লুটে নেবার পর আজ হঠাৎই আবিষ্কার করে ফেলেন যে, বেকারত্বের পাথর জমে গেছে আমাদের মরা বাগিচায়! হায়! কৃষকের জমি লুটে নিয়ে 'সাধের ন্যানো' চাটি বাটি গুটিয়ে 'পাছা দেখিয়ে' বুক পেতে দিয়েছে 'মোদির' রাজ্যে — কেন্দ্রের কাছ থেকে আটত্রিশ হাজার কোটি টাকার 'স্টিমিউলাস প্যাকেজ' (খয়রাতি ডোল) চেয়ে নিয়ে পুঁজিপতি টাটা মোটরস, অশোক লে-ল্যান্ড এবং স্বরাজ মজুমদারদের পূজোপাচার পাঠাচ্ছে গরীবের সরকার (রাজ্যটায় এখনও লেনিনের নাম করা হয়)! এখন এক কেজি চাল মাত্র দুই টাকায় বিকায় — সদ্য গোঁফ-গজানো ছেলেদের প্রতি ঘন্টায় একটি কবিতা লেখার মতো এখন এরাজ্যে ঘন্টায় ঘন্টায় শিলান্যাসের সময়। শব্জীতে বিষ, মিঠাইতে বিষ, মদে বিষ, ঔষধে বিষ, নন্দীশ্বর -ভৃঙ্গীশ্বর উন্নয়ণেশ্বরদের কথাতেও বিষ — সত্যি, "মানুষ ভুল করেও বিষ খায়" — দীর্ঘ বত্রিশ বছর আগে 'ভুল' করেই বিষ খেয়ে ফেলেছিল মানুষ, ইনসাল্লা।

কিন্তু, আর ভুল নয়। আর নয় ভ্রান্তি। বিষের জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতেও মানুষ এবার যুদ্ধে যাচ্ছে....বদলের বীজ বুনতে চলেছে। আকাশের মেঘ আকাশ থেকে সরে গিয়ে জমেছে মানুষের প্রাণে ও প্রতিজ্ঞায় — সেই মেঘ বর্ষাবেই ..... সেই বর্ষায় সকল বিষ, সব পাপ ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যাবে.... জয় মা কালী করালী।...

('পাছা দেখিয়ে' নামক শব্দ দু'টির জন্যে শ্রদ্ধেয় বিনয় কোঙারের কাছে ঋণ স্বীকার —লেখিকা)

বিজেপির প্রার্থী তালিকা

সত্যব্রত মুখোপাধ্যায়	কৃষ্ণনগর
সুভাষচন্দ্র বর্মন	বালুরঘাট
তথাগত রায়	উত্তর কলকাতা
রাহুল সিন্‌হা	বাঁকুড়া
দ্বীপেন্দ্রনাথ প্রামাণিক	জলপাইগুড়ি
অঘোষিত	আলিপুরদুয়ার
নবেন্দু মাহালি	ঝাড়গ্রাম
প্রভাকর তেওয়ারি	ব্যারাকপুর
দাওয়া শেরপা	দার্জিলিং
রাহুল চক্রবর্তী	উলুবেড়িয়া
স্বপন কুমার দাস	বসিরহাট
দেবব্রত চৌধুরী	শ্রীরামপুর
অমলেশ মিশ্র	কাঁথি
রাজশ্রী চৌধুরী	তমলুক
মহীতোষ বাউড়ি	বর্ধমান (পূর্ব)
ভবেন্দ্রনাথ বর্মন	কোচবিহার
পলি মুখোপাধ্যায়	হাওড়া
ব্রতীন সেনগুপ্ত	বারাসাত
গোপেশচন্দ্র সরকার	রায়গঞ্জ
অম্লান ভাদুড়ি	উত্তর মালদা
দীপক চৌধুরী	মালদা দক্ষিণ
দেবাশিষ চন্দ্র মজুমদার	জঙ্গিপুর
বিদ্যুৎ কুমার হালদার	বহরমপুর
নির্মল সাহা	মুর্শিদাবাদ
সুকল্যাণ রায়	রাণাঘাট
কে পি মজুমদার	বনগাঁ
তপন সিকদার	দমদম
নিরোদ হালদার	জয়নগর
বিনয় কুমার বিশ্বাস	মথুরাপুর
অভিজিৎ দাস	ডায়মণ্ড হারবার
সনৎ ভট্টাচার্য	যাদবপুর
জ্যোৎস্না বন্দ্যোপাধ্যায়	দঃ কলকাতা
চুনীলাল চক্রবর্তী	হুগলী
মুরারী বেরা	আরামবাগ
মতিলাল খাটুয়া	ঘাটাল
সনাতন বসু	পুরুলিয়া
প্রদীপ পট্টনায়ক	মেদিনীপুর
জয়ন্ত মণ্ডল	বিষ্ণুপুর
আলি আফজল চাঁদ	বর্ধমান
সূর্য রায়	আসানসোল
অর্জুন সাহা	বোলপুর
তাপস মুখোপাধ্যায়	বীরভূম

পশ্চিমবঙ্গে অবাধ নির্বাচনের রাজনীতি বানচাল করছে সি পি এম

নবকুমার ভট্টাচার্য

লোকসভা ভোট আসন্ন। গণতন্ত্রে প্রতিটি যোগ্য ভোটারের ভোটদান সুনিশ্চিত করাই নির্বাচন কমিশনের প্রধান দায়িত্ব। সুতরাং প্রতিটি যোগ্য ভোটদানকারীর নাম তালিকাভুক্ত করা প্রথম প্রয়োজন। এরাজ্যে ভোট মানে সন্ত্রাস, রিগিং, ভয় দেখানো সমার্থক হয়ে যাচ্ছিল। ইদানীং কিছু কিছু ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের কাজে সাধারণ মানুষ এখন সাহসী হয়ে উঠছেন। রাজ্যে ভোট জালিয়াতির বিচিত্র কান্ডকারখানা দেখতে দেখতে মানুষ হতাশ হয়ে গিয়েছিল। আর হবে নাই বা কেন? সিপিএম সারা বছর ধরে ভোটের প্রস্তুতি নেয়, বিরোধীরা ভোটের সময় উদয় হয়। সিপিএমের ইলেকশন মেশিনারিতে অস্ত্র একটা নয়, অনেক এবং চালু থাকে সারা বছর। তাদের কর্মকান্ডের মধ্যে থাকে, ভোটার তালিকা নিজেদের ভোটে জেতার মতো করে সংশোধন করা। সমর্থকদের নাম ঢোকানো, বিরোধীদের বেছে বেছে বাদ দেওয়া। পার্টি সমর্থকদের নাম একাধিক পাটে অন্তর্ভুক্ত করা। প্রতিটি বুথে বিরোধী সমর্থকের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া। অনেক সময় মৃত বলে বা ওই ঠিকানায় থাকে না বলে নাম বাদ দেওয়া হয়।

বামফ্রন্ট শাসনে ক্রমে ক্রমে যে বিপদটা

এ রাজ্যের জনগণের কাছে সবচেয়ে বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে সেটা গণতন্ত্র এবং ব্যক্তি স্বাধীনতার অভাব। মার্কসবাদীদের কাছে পার্টিই সব কিছু, ব্যক্তি পরে। দলের মতের সঙ্গে সমাজকে রাজি করাতে এরা ছল বল কৌশল সব কিছুই প্রয়োগ করে। এই কাজে পশ্চিমবঙ্গের মার্কসবাদী দল কতটা সফল তা প্রত্যেকটি বঙ্গবাসী হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন।

এই ফাঁসটা গ্রামেই বেশি করে মালুম হয়, বিরোধিতা দূরে থাক, নিরপেক্ষতাও সেখানে সহ্য করা হয় না। সেখানে মানুষ কেমন ভাবে জীবন যাপন করবে, কার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করবে, কীভাবে কথা বলবে — সব ঠিক করে দেবে দলের নেতা বা ক্যাডাররা। এরাজ্যে মেধার প্রকৃত মূল্যায়ণ হয় না, পার্টির প্রতি আনুগত্যই শেষ কথা। কেবল বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপাচার্য নিয়োগের কান্ডটা একটু তলিয়ে দেখলেই পার্টিবাজির চেহারাটা পরিষ্কার হবে যে কোনও মানুষের কাছে। সর্বস্তরে এই লজ্জাজনক দলবাজির ফলেই সমাজ ও শাসন ব্যবস্থায় জন্ম নিয়েছে দুর্নীতির যোগসাজসের একটা অশুভ চক্র। এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে গেলে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের প্রয়োজন। রাজ্যে এই পরিবর্তনের হাওয়া যে বইছে তা সাম্প্রতিক উপনির্বাচনগুলি থেকেই জানা যাচ্ছে। কিন্তু সিপিএম এবং প্রশাসনের অশুভ যোগসাজস ভোট জালিয়াতিকে যে উচ্চতায় নিয়ে গেছে তাতে কি পরিবর্তন সম্ভব? অন্য রাজ্যের মানুষের পক্ষে কল্পনা করাই সম্ভব নয় যে পশ্চিমবঙ্গের ভোট জালিয়াতি কতটা সূক্ষ্ম। একমাত্র বিশেষ পর্যবেক্ষক আফজল আমানুল্লা পশ্চিমবঙ্গের মার্ক্সবাদী দল এবং প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে গড়ে ওঠা নিখুঁত নির্বাচন চক্রটির রহস্য কিছুটা হলেও উদ্‌ঘাটন করতে চেষ্টা করেছিলেন। তিনি তাঁর রিপোর্টে জানিয়েছিলেন এরাজ্যের আই এ এস, আই পি এস ও অন্যান্য পদস্থ সরকারি অফিসাররা যে কতটা নির্লজ্জের মতো পক্ষপাতমূলক আচরণ করেন তা সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম কান্ড চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে।

এ অবস্থায় কর্তব্য? প্রত্যেকটি মানুষকে সজাগ সচেতন হতে হবে। ভোটার তালিকায় আপনার নাম রয়েছে কি না তা অবশ্যই দেখুন। আপনার বাড়িতে কোনও জাল ভোটার ঢুকে রয়েছে কি না ভোটার তালিকায় তা লক্ষ্য করুন। জাল ভোট গণতন্ত্রের বিপদ। দেশের বিপদ। সর্বোপরি বেআইনি বিদেশি ভোটদাতারা রাষ্ট্রের নিরাপত্তার দিক থেকে অত্যন্ত বিপজ্জনক। এরাই হয়তো আগামী দিনে মন্ত্রী পরিষদের সদস্য তথা নীতি নিয়ামক হয়ে উঠবে। এ ব্যাপারে আপনি সতর্ক থাকুন এবং আইন সম্মত পথে প্রতিবাদ করতে অগ্রসর হোন।

নির্বাচনে ভোট দেওয়ার অধিকার, মৌলিক অধিকার — কোনও রাজনৈতিক দল তা দেয়নি। সংবিধান প্রতিটি মানুষকে এই অধিকার দিয়েছে। কিন্তু সিপিএম এই অধিকার কেড়ে নিতে উদ্যত হয়েছে বারবার। দেখা গিয়েছে দরিদ্র অশিক্ষিত মানুষকে ভোটই দিতে দেওয়া হয়নি অথবা হুমকি দিয়ে ভোট আদায় করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারে সিপিএমের দালালের অভাব নেই। কেন্দ্রীয় সরকার আগামী দিনে জনগণ সচেতন হলে পরিবর্তন সম্ভব। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম সে পথই দেখিয়েছে।

Swastika
23 March - 2009, Rs. 4.00 only
RNI No.5257/57
Registered No. SSRM/Kol. RMS/W.B./RNP - 048/2007-09
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
L.No. MM&P.O. - SSRM-Kol. RMS/ RNP-048/LPWP-021/2007-09

বিচ্ছিন্নতাকামী সন্ত্রাসে রক্তাক্ত শ্রীলঙ্কা

অর্ণব নাগ

বেশ কয়েক বছর আগের একটা ঘটনা Kashmir Herald-web Edition, June ২০০৪-এ 'দক্ষিণ এশিয়ার জাতিগত বিভাজনের প্রস্তাব' শিরোনামে একটি মানচিত্র প্রকাশিত হয়। '২০০০ খৃস্টাব্দে' 'মুঘলস্তান রিসার্চ ইনস্টিটিউটে'র জনৈক জাহাঙ্গীর খানের তৈরি করা ওই মানচিত্রে পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ থেকে শুরু করে জম্মু-কাশ্মীরসহ ভারতবর্ষের উত্তরাংশ (প্রাচীন ভারতের আর্যাবর্ত) এবং এখনকার বাংলাদেশ নিয়ে তৈরি হবে নাকি 'মুঘলস্তান'। ওই মানচিত্রের একটি বিশেষ দিক হল ভারতের দাক্ষিণাত্য তামিলনাড়ু ও শ্রীলঙ্কার উপরের অংশটুকু নিয়ে গঠন করা হয়েছে 'নয়া তামিলনাড়ু'। মানচিত্রে বিগত পাঁচ বছর পূর্বে হাস্য-কৌতুকের উদ্রেক করলেও, গত একমাসে (ফেব্রুয়ারি, ২০০৯) কয়েকটি সন্ত্রাসের নমুনায় আতঙ্কের চোরাস্রোত দেখা দিচ্ছে। নমুনাগুলি মোটামুটি এরকম — (১) ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধাত্রীভূমি অধুনা পাকিস্তানের সোয়েট উপত্যকার দখল সম্পূর্ণ তালিবানদের হাতে, যার নিদর্শনস্বরূপ সেখানে খবরের খোঁজে যাওয়া এক পাক-সাংবাদিককের গুলি করে হত্যা। (২) শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট রাজাপাক্ষে যতই দাবি করুন না কেন যে এল. টি. টি. ই. শেষ; গত ২৩ ফেব্রুয়ারি তামিল টাইগারদের

রাজাপাক্ষে

শ্রীলঙ্কার রাজধানী কলম্বোয় বোমা বিস্ফোরণ সেই দাবির পক্ষে কোনও ন্যূনতম প্রমাণও দাখিল করতে এখনও পারেনি। (৩) গত ২৫ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বি. ডি. আর. জওয়ানদের বিক্ষোভ। যে বিক্ষোভের বলি অসংখ্য সেনাকর্তা। যে বিক্ষোভে ইন্ধন যুগিয়েছে ইসলামিক মৌলবাদী শক্তি এবং এই শক্তির শিকড় এত গভীরে বিস্তৃত যে তার সামনে হয় তো বা সন্ত্রাসবাদ বন্ধে আন্তরিক শেখ হাসিনা সরকারকেও অসহায় লাগছে। (৪) গত ৩ মার্চ লাহোরের গদ্দাফি স্টেডিয়ামে খেলতে যাওয়ার পথে সন্ত্রাসবাদী হানায় রক্তাক্ত শ্রীলঙ্কার জাতীয় দলের ক্রিকেটাররা। একমাত্র শ্রীলঙ্কা বাদ দিয়ে উপমহাদেশের আর কোনও দেশই সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট নীতি গ্রহণ করতে পারছে না। বিশেষ করে পাকিস্তানে তো 'সর্ষের মধ্যেই ভূত' রয়েছে। আসিফ আলি জারদারির সরকার নিজেদের গদি বাঁচানোর তাগিদে নিজেরাই সন্ত্রাসের মদতদাতা। মুম্বাই বিস্ফোরণে জড়িত পাক নাগরিক আজমল কাসভের পাক নাগরিকত্বের সুস্পষ্ট প্রমাণ ভারত দেওয়া সত্ত্বেও ক্রমাগত পাকিস্তানের তা অস্বীকার করা এবং তালিবানী সন্ত্রাসে ক্রমাগত মদত দেওয়া নিয়ে বিশ্ববাসীকে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা প্রমাণ করে, সন্ত্রাস রোধে তাদের কোনও সদিচ্ছাই নেই। সম্প্রতি মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা এফ. বি. আই. তাদের দেওয়া এক রিপোর্টে উল্লেখ করেছে যে, পাকিস্তান ও বাংলাদেশকে ইতিমধ্যেই বারুদের স্তূপে পরিণত করেছে আল কায়দা। তাদের পরবর্তী লক্ষ্য ভারত। সেই রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশকে পুরোপুরি কবজা করে ফেলেছে তালিবানী জঙ্গি সংগঠনগুলি এবং এই মুহূর্তে যা পরিস্থিতি তাতে শেখ হাসিনা সরকারের পক্ষে একক প্রচেষ্টায় এই সন্ত্রাসবাদের মূলোৎপাটন অসম্ভব। সন্ত্রাসের প্রশ্নে ভারতের নরম মনোভাবে উৎসাহিত হচ্ছে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলো। আর সামনে ভোট এসে যাওয়ায় সন্ত্রাস প্রশ্নে এখন সরকারের নীতি হল 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি!' তবে এফ. বি.আই.-এর রিপোর্টের পরেও যদি ভোটের তাগিদে সরকারের ঘুম না ভাঙে তবে আগামী দিনে কোথাকার জল যে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা ভেবে শিউরে উঠতে হচ্ছে। তবে এর মধ্যে একমাত্র আলোকরেখা অবশ্যই শ্রীলঙ্কার রাজাপাক্ষে সরকার। সন্ত্রাস দমনে তাঁদের আন্তরিকতা উপমহাদেশের একমাত্র ব্যতিক্রমী ঘটনা বললে বোধহয় খুব একটা ভুল বলা হবে না। তবে একটা অভিযোগ থেকে তাঁর সরকারকে কিছুতেই মুক্ত করা যাচ্ছে না। আর তা হল, সন্ত্রাস দমন (পড়ুন এল. টি. টি. ই.) করতে গিয়ে সেনাবাহিনীর হাতে মারা যাচ্ছেন অসংখ্য নিরীহ তামিল নাগরিক।

এই মুহূর্তে কিছুটা হলেও দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছে তামিল টাইগার প্রধান ভেলুপিল্লাই প্রভাকরণের। একের পর এক দুর্গ হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে তাঁর। তামিল জঙ্গিদের প্রধান ঘাঁটি কিলিনোচ্চি হাত ছাড়া হয়েছিল বহুপূর্বেই। তখন কিলিনোচ্চিকে পোড়া শহর বলে দায় সেরেছিল তামিল জঙ্গি সংগঠন এল. টি. টি. ই.। তাদের পক্ষ থেকে তখন দাবি করা হয়েছিল শ্রীলঙ্কার সেনাবাহিনী আসলে যা দখল করেছে তা একদা টাইগারদের প্রধান ঘাঁটি হলেও বর্তমানে তার আর কিছুই অবশিষ্ট নেই, বরং সেই সাথে তারা এও দাবি করেছিল, তাঁদের মূল ঘাঁটি এখন বন্দরশহর মুল্লাইথিভু। শ্রীলঙ্কার সেনাবাহিনীর কাছে এল. টি. টি. ই.-র চ্যালেঞ্জ ছিল ক্ষমতা থাকে তো তারা দখল করে দেখাক এই বন্দর শহরটি। এই রকম দাবির পেছনে বেশ কয়েকটি কারণ কাজ করেছিল। প্রথমতঃ টাইগাররা ধরেই নিয়েছিল মুল্লাইথিভুতে পৌঁছতে গেলে সে দুর্গম পুথুক্কুদিয়িরুপ্পুর জঙ্গল পেরোতে হবে সেনা-বাহিনীকে তা এক কথায় অসম্ভব। দ্বিতীয়ত কোনওক্রমে বিমানযোগে বা অন্য কোনওভাবে ওই জঙ্গল পেরোলেও বন্দর শহর মুল্লাইথিভুতে এসে তারা কিছুই করতে পারবে না। কারণ এই শহরের চারপাশে রয়েছে সমুদ্র। বরং বলা ভালো এল. টি. টি. ই.-এর নৌঘাঁটির খুব কাছাকাছি রয়েছে এই শহর। সুতরাং বিপদ বুঝলে প্রভাকরণের পালানোর ছকও ভেবে রেখেছিল তারা। তৃতীয়তঃ টাইগারদের আরেক ঘাঁটি ওয়ান্নির জঙ্গলে (যার বর্ণনা ১৭ নভেম্বর, ২০০৮ স্বস্তিকায় প্রকাশিত) যেভাবে, যে পদ্ধতিতে আক্রমণ চালিয়েছিল শ্রীলঙ্কা সেনাবাহিনী পুথুক্কুদিয়িরুপ্পুরে তা ব্যুমেরাং করার যাবতীয় পরিকল্পনাও ছকে রেখেছিল তারা। কিন্তু এখন তা পালটা ব্যুমেরাং হয়ে ফিরে আসছে টাইগারদের কাছেই। ইতিমধ্যে ওই জঙ্গলে প্রভাকরণের বসবাসকারী ব্যাঙ্কার গুঁড়িয়ে গিয়েছে সেনাবাহিনীর দৌলতে। ধরা পড়ার ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন এল. টি. টি. ই. সুপ্রিমো প্রভাকরণ। গত ৬ ফেব্রুয়ারি টাইগারদের বৃহত্তম নৌঘাঁটি 'চালাই টাইগার বেস' দখল করে ফেলেছে শ্রীলঙ্কার সেনাবাহিনী। শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট মাহিন্দা রাজাপক্ষে 'fight to finish'-এর ডাক দিয়েছেন।

উপমহাদেশের সন্ত্রাসবাদ নির্মূল করার নিরিখে এল. টি. টি. ই.-র বিরুদ্ধে শ্রীলঙ্কা সরকারের এই লড়াই খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু এই যুদ্ধকে কেন্দ্র করে এমন কিছু বিষয় উঠে আসছে যার পরিপ্রেক্ষিতে এই ইস্যুতে তোলপাড় এখন সারা বিশ্বজুড়েই। টাইগাররা যুদ্ধে নিরীহ তামিলদের ব্যবহার করছে ফাঁদ হিসাবে। এতে শ্রীলঙ্কার সেনাবাহিনীর হাতে প্রতিদিন প্রতিনিয়ত তামিল টাইগাররা ছাড়াও অসংখ্য সাধারণ মানুষ নিহত হচ্ছেন। এবিষয়ে রাষ্ট্রপুঞ্জের মহাসচিব বান কি মুনসহ ভারত, আমেরিকা ও ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলি গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। কিন্তু এ নিয়ে আন্তর্জাতিক চাপও কাবু করতে পারছে না রাজাপাক্ষেকে। টাইগারদের শেষ করার ব্যাপারে তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তবে তারা যে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি এটা বোঝাতে সাম্প্রতিকতম বোমা বিস্ফোরণটি তারা ঘটিয়েছে কলম্বোয়। ইতিপূর্বে তাদের ক্যাডাররা দ্বীপের পূর্বদিকের মাডিল আব্রু স্লুইস গেট বন্ধ করে প্রায় ৩০,০০০ নাগরিকের কাছে জল পৌঁছতে বিঘ্ন সৃষ্টি করেছিল। শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ যে তিনি তামিলদের রক্ষা করতে মোটেও আন্তরিক নন। একদিকে শ্রীলঙ্কা সরকারের যুদ্ধবিরতিতে রাজি না হওয়া, অপরদিকে এল. টি. টি. ই.-র অস্ত্র প্রত্যাহার না করা এই দুয়ের যাঁতাকলে পড়ে অসংখ্য নিরীহ তামিলের জীবনহানি হয়ে চলেছে।

এরই মধ্যে একটি ভয়ঙ্কর অভিযোগের কথায় আসা যাক। অভিযোগটি হল এই যুদ্ধের ফলে একট বড় তামিল জনগোষ্ঠী নিরুদ্দিষ্ট হয়ে গিয়েছে। ঘটনাটি মোটামুটি এরকম— ২০০৬-এর জুলাই-আগস্টে দ্বীপের পূর্বদিকে এবং ২০০৭-এর সেপ্টেম্বরে উত্তরদিকে শুরু হওয়া মিলিটারি অপারেশনের পর প্রায় ১৪,৮০০ বর্গ কিলোমিটার সাম্রাজ্য এল. টি. টি. ই-র হাতছাড়া হয়েছে। পাঁচটি উত্তরের রাজ্য নিয়ে প্রসারিত ছিল এই সাম্রাজ্য। এই পাঁচটি রাজ্য হল মান্নার, ভাড়ুনাইয়া, কিলিনোচ্চি, মুল্লাইথিভু ও জাফনা। সেনাবাহিনীর দাবি অনুযায়ী ৬৮টি ছোট ও মাঝারি শহর এবং গ্রামের ওপর দিয়ে তারা মার্চ করতে সমর্থ হয়েছে যেগুলি একদা এল. টি. টি. ই. সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ওই অঞ্চলের প্রায় ২.৭৩ লক্ষ নাগরিক আজ বেপাত্তা। এই তথ্যটি কিলিনোচ্চি এবং মুল্লাইথিভু দখলের আগে পর্যন্ত পাওয়া। সুতরাং স্বাভাবিভাবেই অনুমান করা হচ্ছিল তারা হয়তো ওই দুটি জেলায় রয়েছে। এখন ওই দুটি জেলায় আক্রমণের পর দেখা যাচ্ছে ওই মানুষদের সামনে রেখে শ্রীলঙ্কার সেনাবাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করার চেষ্টা চালাচ্ছে তামিল জঙ্গিরা। এদিকে আবার মাহিন্দার নেতৃত্বাধীন সেনাবাহিনীও আক্রমণের লক্ষ্যে অনড় থাকার জন্য অসংখ্য নিরীহ নাগরিকরা প্রাণ হারাচ্ছেন। সংবাদমাধ্যমের দেওয়া তথ্যানুযায়ী, পুথুক্কুদিয়িরুপ্পুরে পুনর্বাসন পাওয়া ১.২ লক্ষ তামিল নাগরিক বিগত ১৭ মাস যাবৎ উদ্বাস্তুদের ন্যায় জীবনযাপন করেছেন। এঁদের অধিকাংশই অসুস্থ। আর

প্রভাকরণ

সেখানে স্বাস্থ্য পরিষেবার হাল ভয়ানক। হাসপাতাল বলতে P. T. K. এবং ভিসুয়ামাড়ু হাসপাতাল। এই ১৫০ শয্যাবিশিষ্ট P. T. K. হাসপাতালে অত্যন্ত জরুরী ভিত্তিতেইতিমধ্যেই ৫০০ জন রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এর সাথে আরও ৩০০ বিপর্যস্ত নাগরিক আশ্রয় নিয়েছেন এর চত্বরে। অনাহার, অর্ধাহার আর অনশন এভাবেই এখন দিন কাটছে শ্রীলঙ্কার তামিল নাগরিকদের। একদা তামিল সাম্রাজ্যভুক্ত এলাকা থেকে উৎখাত হওয়া অধিকাংশই এখন একমাত্র ভরসা বহিরাগত সাহায্য।

আসলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এই মুহূর্তে সন্ত্রাস এবং বিচ্ছিন্নতাবাদ পাকেচক্রে পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে গেছে। শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটারদের ওপর হামলার পর দুই ভিন্ন ধান্দায় তালিবান ও তামিল জঙ্গিরা একত্রিত হতেই পারেন। সেক্ষেত্রে সন্ত্রাস মোকাবিলায় নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবে উপমহাদেশ। কারণ তখন শুধু সন্ত্রাস-বাদীদের নয়, বিচ্ছিন্নতাবাদী নামক বিভিন্ন জনগোষ্ঠীকে শুধুমাত্র আপন স্বার্থে আবেগের বশবর্তী হয়ে খেপিয়ে দেওয়ার কারিগরদেরও মোকাবিলা করতে হবে। তাতে সন্ত্রাসরোধের কাজটা যে আরও কঠিন হয়ে পড়বে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

সুতরাং গুরুদায়িত্ব এখন লঙ্কা সরকারের কাঁধে। এল. টি. টি. ই-র বিরুদ্ধে, লড়াই করার সঙ্গে-সঙ্গে তাঁদের প্রধান কর্তব্য নিরীহ তামিলদের জীবন রক্ষা করা, সেইসঙ্গে শ্রীলঙ্কার অধিবাসী তামিলদেরও সিংহলীদের সমান ক্ষমতা প্রদান করা। তা নাহলে কিন্তু আগামীদিনে আরও অজানা ভয়ঙ্কর রক্তপাতের আশঙ্কায় প্রহর গুণতেই হবে শ্রীলঙ্কাকে।

রক্তাক্ত সংঘর্ষে নিহত সাধারণ মানুষ।

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩ কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।
সম্পাদক ঃ বিজয় আঢ্য, দূরভাষ ঃ ২২৪১-০৬০৩, টেলিফ্যাক্স ঃ ২২৪১-৫৯১৫, e-mail : swastika5915@bsnl.in / vijoy.adya@gmail.com, website : www.eswastika.com